প্রতিমা

সুনীল ঘোষ

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
1780
LIBRARY.
15·12·63
* Agartala. *

পুথিঘর

২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

দাম—তিন টাকা

প্রচ্ছদচিত্র ও বর্ণলিপি
শ্রীনিখিল মুৎসুদ্দি

ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ, ২১৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত ও
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা পুথিঘরের পক্ষ হইতে
শ্রীসতীশ রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

ভারত ও ভারতের বাইরে যে সমস্ত শান্তিকামী নরনারী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধের সংগ্রামে এগিয়ে এসেছেন—

কে, এম, সীমহাচলম নামে কোন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক মাসিক বসুমতী, চতুষ্কোণ প্রভৃতি কয়েকটি পত্রিকায় কিছুকাল যাবৎ বাঙলা গল্প লিখছিলেন। গল্পগুলি আমার ভাল লাগায় আমি তাঁর খোঁজ খবর করে জানতে পারি যে, তিনি আদৌ মান্দ্রাজী নন, খাঁটি বাঙালী। তিনিই এই উপন্যাসের লেখক শ্রীসুনীল ঘোষ।

প্রকাশক

রণাঙ্গনের বর্ণনাটা আমি নিয়েছি গণতান্ত্রিক বিশ্ব-নারী সংস্থার একটি রিপোর্ট থেকে এবং আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা কপি করে দিয়েছেন শ্রীমতী আরতি পাকড়াশী এবং শ্রীমতী লিলি বসু। আরও একটি কথা: অনুসূয়া নামটি ব্যাকরণের খাতিরে অনসূয়া হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি প্রচলিত উচ্চারণ ব্যবহার করেছি— লেখক

সহর প্রাচীন। ইতিহাসের পাঁজি-পুঁথিতে নিজের স্থান করে নিয়েছে কয়েক শ' বছর আগেই। দিল্লী থেকে লাহোর যাবার পথে সাজাহান অথবা জাহাঙ্গীর, নুরজাহান অথবা মমতাজ যে দুদিনের জন্য আম্বালায় যাত্রাভঙ্গ করেন নি—এমন কথা কেউ বলতে পারে না। উত্তর-দক্ষিণে সহর চিরে বেরিয়ে গেছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—একদিকে ক্যাণ্টনমেণ্ট আর এক দিকে সিটি। সহরের ঠিক মাঝখানে ট্রাঙ্ক রোডের তলা দিয়ে চলে গেছে ইরিগেসান ক্যানাল। সারা দিনরাত তার চঞ্চল জলধারা বাঁধানো পাড়ে আঘাত খেয়ে খেয়ে ছল ছল করে ওঠে। উপরে কংক্রিটের পোল আর তার ঠিক পাশেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত প্রাসাদ। প্রাসাদ-আঙিনায় মালিকার সমাধি—শ্বেত-পাথরে তৈরী। তার উপর প্রখর মধ্যাহ্নে ছায়া দেয় একটি শ্বেত-করবীর শাখা।

সমাধিফলকে উর্দু ভাষায় লেখা আছে—'সাহাদারার মহামান্যা বেগম আইজাল বেহস্তে যাবার অপেক্ষায় এখানে নিদ্রামগ্ন।' বেগমের নাম অনুসারে পোলের নাম হয়েছে

বেগমপুল। বেগম নেই, নেই তার আতর কাজল ওড়না আর জাঁক-জমকের চোখ ধাঁধানো বিলাস-ব্যসন, কিন্তু আছে তার বিস্ময় স্মৃতিভরা সজীব কাহিনী। নতুন লোককে নেশা ধরিয়ে দেয়।

পোলের ডান দিকে শনি-মঙ্গলবারে হাট বসে ভেলিগুড় আর গমের। উট আর গরুর গাড়ীতে ভরে যায় বড় মাঠটা। দেশ-বিদেশের বণিক আসে। কেনাবেচা করে, ষ্টেশন থেকে দূর দূর দেশে চালান দেয় গমের বস্তা আর ভেলিগুড়ের পেটি। হাটের দিনে ধূলোর ধোঁয়ায় বেগমপুল দিয়ে পথ হাঁটাই মুস্কিল হয়ে পড়ে সৌখীন লোকদের।

বেগমপুল থেকে সদরবাজার যেতে টোঙ্গা ভাড়া লাগে ছ'আনা। সৌখীন দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র সদরবাজারের জৌলুস সহজেই আকৃষ্ট করে ক্রেতাকে। ক্যাণ্টনমেণ্টের মিলিটারী অফিসারদের কাঁচা-পয়সায় যুদ্ধের পর থেকে এ বাজারের রূপ যেন ফেটে পড়তে চায়।

বাজারের পেছন দিকে কয়েক বিঘা জমির উপর যে প্রাসাদটি সকলের নজরে পড়ে, সেটার মালিক আনন্দ চাটুয্যে। আর বাজারের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কালীবাড়ীর মালিক বসন্ত চক্রবর্তী। বাঙলার হাজার মাইল পশ্চিমের এই সহরে স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দা মাত্র এই দুই ঘর। তাঁরা

নাকি সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকে আছেন এখানে। আনন্দবাবুরা বংশানুক্রমে চিকিৎসক আর বসন্তবাবুরা মন্দিরের সেবাইত! আনন্দ চাটুয্যে কোনো ভ্রাম্যমাণ বাঙালীর সাক্ষাৎ পেলে বলেন, 'সে মোশাই বোলবেন না। হামার ঠাকুরদা বোলতে গেলে সমস্ত আম্বালা জেলাটারই মালিক ছিলেন। তখন কি এখানে লোক বাস কোরত? খালি জঙ্গল! জঙ্গল কেটেই আমাদের বাস। লেকিন মোশাই বাঙালা দেশকে হামরাও বোড়ো ভালবাসি। সেইজন্য ছেলের সাদি হরবখত বাঙলা দেশেই হোয়। হামার 'ওয়াইফ' বাঙালী আছেন, আবার হামার ছেলের সাদি ভি দিয়েছি বাঙালী লেড়কির সঙ্গে। তোবে মেয়েরা হামার সাদি করেছে পাঞ্জাবীদের। ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে রাখতে চাই কিনা তাই এমন বেবোস্থা'। আনন্দবাবুর দুই মেয়ে নানকু আর জানকু পাঞ্জাবী সালোয়ার প'রে ঠোঁটে গালে রঙ মেখে সাইকেল নিয়ে বিকেলে বেড়াতে বেরোয়। কোনো কোনো দিন ওদের একজনকে দেখা যায়, ধোপদোরস্ত স্যুট পরা, চোখে গগ্‌ল্‌স্‌ আঁটা কোনো ছোকরার মোটরে তারই গায়ে গা-ঘেঁসে বসে আছে মদালসা ভঙ্গিতে। দোকানদাররা বলে, পাতিয়ালার মন্ত্রীর ভাইপো জাওলাপ্রসাদ জানকুকে বাগাবার তাল করছে। ওর স্বামী মেজর সাহেব এখন বাগদাদে লড়াই করছে কিনা! আনন্দ চাটুয্যের ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর বড় ছেলের বউ সমীরা কলকাতা থেকে

আসার পর কেন মন খাবাপ করে থাকে দিবারাত্রি তা তিনি ভেবে পান না। নানকু জানকুরা বলে, 'জানো বাবা, বৌদিটা পূরো দেহাতী, রুজ মাখতে নাকি লজ্জা করে, আর পায়জামা পরবার আগে নাকি ও আত্মহত্যা করবে। সিলি, সিলি। তাই না বাবা?' আনন্দ চাটুয্যে বুঝতে পারেন না। পুত্রবধূর শান্ত সংযম এবং ভীরু নম্রতাব মধ্যে কোথায় যেন শান্তি খুঁজে পান। তাই তাকে খুশী করার জন্য মাসে মাসে একসেট করে নতুন গহনা গড়িয়ে দেন। বউ সহাস্যে গ্রহণ করে, পবতে চায় না। শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও নয়। এখানে ওর মন টেঁকে না।

বসন্ত চক্রবর্তী জরাজীর্ণ কালীবাড়ির একপাশে বোর্ডিং খুলেছেন। শুধু কালীবাড়ির আয়ে আর সংসার চলতে চায় না। বাঙালী ক্যানভাসার আর রিপ্রেজেণ্টেটিভরা গিয়ে ওঠে সেখানে। সিটভাড়া দিতে হয় না আর খাবার খরচাও খুবই সস্তা--মাত্র দেড় টাকা দৈনিক। মৃতদার বসন্ত চক্রবর্তী এক পাল ছেলেমেয়ে মানুষ করতেই অকালে বুড়িয়ে গেছেন। সন্ধ্যার পর হুঁকো হাতে যাত্রীদের ঘরে আসেন আড্ডা মারতে; বলেন, 'আম্বালায় আমাদের এই চার পুরুষ হল। আনন্দের পিসিমা হচ্ছেন আমার ঠাকুমা। পয়সার গরমে আজকাল ওরা ফিরেও তাকায় না। মেয়ে দুটো তো হযেছে ইয়ে।' ইয়ে কথাটার মধ্য দিয়ে নানকু জানকু সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করতে চান সেটা অশ্লীল।

অধিকাংশ বহিরাগত এই কাহিনীর খেই খুঁজে পায় না, তাই ব্যাপারটা মুখরোচক হলেও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অবশেষে বসন্ত চক্রবর্তীকে তাসের খেড়ু খুঁজতে হয়।

বোর্ডারদের রেঁধে খাওয়ায় বড় মেয়ে লীলা। মোটা-সোটা ফরসা কুড়ি-বাইশ বছরের অবিবাহিতা মেয়ে। চেহারাটা বোকা বোকা। বাঙলায় নাম সই করতে পারে কোনো মতে। বসন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'বাঙালী ছেলে ছাড়া মেয়ের বিয়ে দেবো না মশাই। আনন্দের মত জাতধম্ম তো খোয়াতে পারি না। নইলে মেয়ে আমার কবে বিকিয়ে যেতো পিলখুয়ার জমিদার রামলগনের ঘরে। বাক্স বাক্স গহনা আর টাকার কাঁড়ি নিয়ে এখনও তো সাধাসাধি করছে। হাজার হলেও বাঙালী মেয়ের ইজ্জতটা দেখতে হবে তো!'

কিন্তু মেয়ে বোধহয় বাঙালী-ইজ্জৎ সম্পর্কে সচেতন নয়। বাঙলা বলে ভাঙা ভাঙা, নাকে ফুল লাগিয়ে আয়নায় মুখ দেখে। হাতে মেহেদী লাগিয়ে মুখে পান টিপে রামলীলা শুনতে যায়। ভীড়ে কোনো পুরুষের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেলে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে, 'আবে ও ছোকরে, আঁখ কিধার রহতা রে?'

তবু মেয়েটি ভাল। বাপের সংসারটা ধরতে গেলে সে একাই ঠেকিয়ে রেখেছে।

ক্যাণ্টনমেণ্ট সহরের মত ঘিঞ্জি অপরিচ্ছন্ন এবং ধূলি-ধূসরিত নয়। বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা পিচ্ঢালা রাস্তা, দুপাশে ঝাউ আর দেবদারুর সারি, মাঝে মাঝে সরকারী বাগিচা।

অসামরিক অধিবাসীরাও কোনো না কোনো ভাবে মিলিটারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উত্তর দিকে প্রায় আধ মাইল স্থান জুড়ে বড় বড় ব্যারাকে মিলিটারী হস্‌পিটাল, দক্ষিণে আর্মি সার্ভিস কোরের গোচারণ-ভূমি এবং ডেয়ারী ফার্ম। পূব দিকে সেকেণ্ড পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের শিক্ষাকেন্দ্র এবং পশ্চিমে রাজপুতানা রাইফেলস্‌। অফিসারদের বাঙলো ক্যাণ্টনমেণ্টের সর্বত্র ছড়ানো, সেপাইরা থাকে ব্যারাকে এবং দেশী অফিসার, জমাদার, সুবাদারদের জন্য আছে সরকারী কোয়ার্টার।

ক্যাণ্টনমেণ্টের সঙ্গে সহরের সামাজিক জীবনের কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই। সহর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন আর ক্যাণ্টনমেণ্ট চলে এরিয়া কমাণ্ডাণ্ট ব্রিগেডিয়ারের নিয়মকানুনে। তা'ছাড়া বছরের প্রায় অর্ধেক সময়েই সৈনিক-দের সহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ছোঁয়াচে রোগের হাত থেকে সৈনিকদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদটা কড়া। যুদ্ধক্ষেত্রে ওরা যাতে সুস্থশরীরে গিয়েই মরতে পারে সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অতি সজাগ।

শীত গ্রীষ্ম দুই-ই এখানে অতি প্রখর। গ্রীষ্মের দিনে সকালে আঁধি, দুপুরে লু আর শীতের দিনে ঘন কুয়াশা আর মৃদু বৃষ্টির সঙ্গে রক্ত-জমানো কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া।

১৯৪৩ সালের কথা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এক বাঙালী ক্যাপ্টেন পুণা থেকে বদলী হয়ে এলো আম্বালার মিলিটারী হাসপাতালে। নতুন পাশকরা, বছর দেড়েক মিলিটারীতে ঢোকা তরুণ ডাক্তার। নাম তার বিকাশ মজুমদার। হাসপাতালের এ্যাডজুটাণ্ট ক্যাপ্টেন ভাটনগর ফিল্ড সার্ভিসে বদলী হওয়ায় তার শূন্য আসন এবং কোয়ার্টার দুটোই পেয়ে গেল বিকাশ। আর পেল সকল কাজে পারদর্শী একটী পরিচারক,—ছোটেলাল। চার কামরাওয়ালা প্রকাণ্ড বাঙলোর উঠোনে চমৎকার ফুলের বাগান। বিকাশ খুশী হল। গেটের পাশে পরিচারকের ঘরও রয়েছে।

কিন্তু এত বড় বাড়ীতে একা থাকতে থাকতে ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠল বিকাশ। ছোটেলাল মাঝে মাঝে বউকে দেখতে যাবার ছুটী চাইত। বিকাশের মাথায় হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল ; বলল, 'তোমার বউ-ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসো এখানে, যদি দরকার হয় বাঙলোর একটা কামরা ব্যবহার কোরো।'

বিশ বছর বাবুর্চিগিরি করছে ছোটেলাল, এমন অদ্ভুত কথা কখনও শোনে নি। অবাক বিস্ময়ে সে সাহেবের মুখের

দিকে তাকিয়ে থাকে। বউকে নিয়ে তার এ বাড়ীতে থাকতে অসাধ হবার কথা নয় কিন্তু নিরাপদ কিনা সন্দেহ আছে। মিলিটারী সাহেবদের মেজাজ মর্জি, খেয়াল খুশী সবই একটু উগ্র রকমের। তবে এ সাহেব যে একটু অন্য ধরণের তা সে টের পাচ্ছে প্রথম দিন থেকেই। বাঙালীরা নতুন মিলিটারীতে ঢুকছে কি না তাই এখনও মেজাজটা রপ্ত করতে পারে নি। ছোটেলাল নিজেকে বুঝিয়েছে এই ভাবে। তবু বউকে এ বাড়ীতে এনে রাখতে সাহসে কুলোয় না তার। কে জানে, কবে কোন ফাঁকে সরাব-টরাব পান করে চেপে ধরে বউয়ের হাত। শেষে জাত মান সবই খোয়াতে হবে তো! সে বলল, 'সেটা কি ভাল হবে সাহেব? আপনার অসুবিধা হতে পারে।'

'কিচ্ছু না কিচ্ছু না', বিকাশ বলে।

কাজে কাজেই শেষ পর্যন্ত বউকে নিয়ে আসতে হল। কিন্তু বুদ্ধি করে মেয়েটিকে রেখে এল তার মাসীমার কাছে। সাত বছরের ছেলে কানাইয়ার হাত ধরে লছমনিয়া স্বামীর ঘর করতে এলো বিকাশের বাঙলোয়।

কিন্তু ক্যাপ্টেন আর তার বেয়ারার জীবনের মাঝখানে মস্ত ফাঁক থেকে যায়। শত সহৃদয়তাও সে ফাঁক ভরে তুলতে পারে না। ওদের সঙ্গে সহজ হয়ে উঠতে পারে না বিকাশ। শিক্ষা, সংস্কার, অভ্যাস এবং পদমর্যাদার প্রাচীর দুই পক্ষের মনের আদান-প্রদানের পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নিঃসঙ্গতা কাটতে চায় না কিছুতেই। বিশাল বাঙলোর শূন্য ঘরগুলো যেন তার মনের ভিতরটাকে আরও ফাঁকা করে তোলে। সারাদিন কাটে হাসপাতালে সহস্র কাজের মধ্যে কিন্তু সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। স্মৃতির কুসুমে গাঁথা দিনগুলো মনের উপর চেপে বসতে থাকে। দিনান্তের মৌনী মায়ায় ফৌজী জীবনের একাকীত্ব ভবিষ্যৎকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে অতীত রোমন্থনের পথে টেনে নিয়ে যায় মনকে। ডিসেম্বরের কলকাতা যেন প্রদীপ্ত আবেগময় দুর্লভ স্বপ্ন। হয়ত লেকের ধারে আড্ডা জমিয়েছে সমীর যতীনেরা কিম্বা হয়ত বকুল মিত্তিরদের বাড়ী গানের আসর বসেছে। বীণা চৌধুরী এস্রাজের সুরে সুরে ছিন্নপাতার তরণী সাজিয়ে একা একা খেলা করার ছলে অরুণ হালদারকে অকারণে উদাস করে তুলছে। মনুমেণ্টের নীচে লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় আবহাওয়া গরম করে তুলেছে ভোলা সেন। কে জানে?

রেডিওর বোতাম ঘুরিয়ে কলকাতাকে কাছে পেতে চায় বিকাশ। পাওয়া যায় না সব সময়। সেটটা জোরালো নয়। গানের অস্পষ্ট কলি হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠে তার পর মিলিয়ে যায় ঘড়ঘড়ে আওয়াজের মধ্যে।

বাজার থেকে একটা পুরোনো পিয়ানো ভাড়া করে নিয়ে এল শিখবে বলে। অনেকদিনের সখ। স্বরলিপি দেখে দেখে দু'দিন বাজাবার চেষ্টা করল। জমল না। অবশেষে পুরোনো

গীটারটায় মন লাগালো। গীটারের আওয়াজ শুনে ছোটেলাল দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়।

'বহুত মিঠা হাত আপকা, বহুত মিঠা।'

'সাচ্ বাত ?'—বিকাশ খুশীতে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'হাঁ সাব, তবলা লাঁউ ক্যা ?'

'জানো বাজাতে ?'

'থোড়া বহুত।'

'লাও।'

তবলায় পাকা হাত ছোটেলালের—উত্তরাধিকার সূত্রে। শেষ পর্যন্ত একাগ্রমনে তবলার লহরাই শুনতে হয় বিকাশকে।

দিন আর কাটতে চায় না। পুণায় বিকাশ থাকত অফিসার্স মেসে। হাসি গল্পে আড্ডায় একরকম ভাবে চলে যেতো। খুব বেশী খারাপ লাগলে ডেকান জিমখানার ধারে পর্বতের চূড়ায় পেশোয়ার তৈরী পার্বতী-মন্দিরে বসে সূর্যাস্ত দেখেও কাটিয়ে দেওয়া যেতো দুটো ঘণ্টা। কিন্তু এখানে এত শীত যে সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে বেরুতেই ভয় লাগে।

হাসপাতালের এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেজর একদিন বললেন, 'ক্যাপ্টেন মজুমদার, তুমিতো অফিসার্স ক্লাবে যাওনা। আজ তোমাদের কলকাতাব এক মেয়ে নাচবে তার দলবল নিয়ে। যাবে নাকি ?'

বিকাশের বিস্ময় লাগে। কলকাতার মেয়ে আম্বালার অফিসারদের চিত্ত বিনোদনের জন্য ক্লাবে এসে নাচবে সদল বলে,—এও কি সম্ভব ?

'ঠিক বলছ তুমি ?'

'এই দেখনা প্রোগ্রাম।'

কলকাতার মেয়ে বটে তবে বাঙালী নয়। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। বিকাশ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'যাবে নাকি ?'

'না।'

'কেন ?'

'পছন্দ হয় না। নাচের আসর শেষ পর্যন্ত মদের বোতল ছোঁড়াছুঁড়িব আসরে গিয়ে দাঁড়াবে।'

মেজর হো হো করে হেসে উঠলেন উচু স্বরে, 'মদটা খেতে শেখো হে। মিলিটারী লাইফে ওসব দরকার হয়। আর চাকরীব উন্নতি করতে হলে ক্লাবে টাবেও যেতে হয়। ওখানে অবাধ মেলামেশা, জেনারেল আর সাব-অল্টার্নে কোনো ভেদাভেদ নেই। নজরে একবার পড়ে গেলেই প্রমোশান।'

'আমি জানি, কিন্তু আমি পছন্দ করি না।'

মেজব আবাব হেসে উঠলেন। কেন পছন্দ করে না জানতে চাইলেন না কারণ তার প্রয়োজন নেই। ছোকরা

অফিসাররা প্রথম প্রথম এমনি রুচির প্রশ্ন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু বেশ মিশে যায় গড্ডলিকায়।

কাণ্টনমেণ্টে সরকারী অর্থানুকুল্যে গড়ে ওঠা অফিসার্স ক্লাব সম্বন্ধে বিকাশের অরুচির চেয়েও আতঙ্কই বেশী। পুণায় থাকতে এক পাঞ্জাবী সহকর্মীর সঙ্গে অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে সে বেশ বিপদেই পড়েছিল। প্রথমতঃ হলঘরের কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল অফিসারদের চেয়েও উগ্র দেহবিলাসী নারীর সংখ্যা সেখানে বেশী। অফিসারদের নিয়ে তারা যেন লোফালুফি খেলছে। টেবলে টেবলে মদের বোতল, গ্লাস, সিগারেট। হল্লা আর উৎকট হাসির দাপটে হলঘর কম্পমান। মদ খাওয়ার অভ্যাস তার ছিল না কিন্তু মদ না খেলে ক্লাবে আসার কোনো মানেই হতে পারে না। বন্ধুর পীড়াপীড়িতে এক পেগ, দু পেগ করে তিন পেগ চুমুক দিয়ে দুটো সিগারেট শেষ করতে করতেই সমস্ত শরীর টলতে আরম্ভ করল আর দুরন্ত বমির বেগ। এর পর আর বসে থাকলে হলঘরেই চূড়ান্ত কেলেঙ্কারী ঘটে যাবার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরে গাছপালার ঘেরা অল্প আলোকিত উঠোনে এসে দাঁড়াতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে যে মেয়েটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আজও তার কথা ভাবলে মনটা অসুস্থ হয়ে ওঠে বিকাশের। হয়তো সে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অথবা গোয়ানীজ। নেশার

ঘোরে ভাল বুঝতে পারে নি। ব্ল্যাক-আউটের ম্লান আলোয় উঠোনের একটি ঝোপের পাশ থেকে মেয়েটির হঠাৎ এসে উদয় হয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকানোর সেই পরিবেশটা আজও আতঙ্কের মত লাগে।

বিকাশের দুটো হাত ধরেছিল মেয়েটি শক্ত মুঠোয়। সে মুঠো ছাড়ানো কঠিন ছিল। ওকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে হেসে এগিয়ে এসেছিল একেবারে বুকের কাছে। ডান হাতে বিকাশের কোমর জড়িয়ে বলেছিল, 'লজ্জা কি! তুমি তো আর কলেজে পড়া ছোট্ট ছেলে নও, এ্যান অফিসার ইন দি আর্মি। এসো।'

বিকাশকে টানতে টানতে প্রায় গেটের কাছ পর্যন্ত এনেছিল। কিন্তু সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ব্রিটিশ মিলিটারী হসপিটালের কমাণ্ডাণ্ট কর্ণেল ব্রিগসের সঙ্গে।

'হু ইজ দ্যাট? ক্যাপ্টেন মজুমদার?'

বড় সাহেবের গলা পেয়ে বিকাশ হঠাৎ পায়ে পা ঠুকে স্যালুট করতে গিয়ে দেহের ঝাঁকুনীতে ছিটকে ফেলেছিল মেয়েটিকে।

মেয়েটি আবার এগিয়ে আসছিল কিন্তু ব্রিগস তাকে ধমক লাগান, 'বি অফ আই সে। ওর সঙ্গে জরুরী কাজ আছে আমার।'

মেয়েটি অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

'ভেরি ব্যাড মজুমদার, ভেরি ব্যাড। আমার মনে হয়, তোমার রুচিবিকার ঘটেছে, নইলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের পেছনে ছুটতে না। ওরা শয়তানের সন্তান, জীবন্ত নরক। তোমাকে শেষ করে ছেড়ে দেবে। নিজেকে নষ্ট কোরো না বুঝলে!'

দো-আঁসলা জাতের উপর দারুণ ঘৃণা ছিল কর্ণেল ব্রিগসের। বলতেন, 'ওদের রক্তটাই দূষিত, বাষ্টার্ড।' আরও অকথ্য ভাষায় গাল দিতেন। হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষের মত ছিল তাঁর ফিরিঙ্গি বিদ্বেষ। তাঁর হাসপাতালে কোনো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স টিকতে পারতো না। কোনো না কোনো ছুতো করে তাদের বদলী করে দিতেন।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সত্যিই শয়তানের বংশধর কিনা তা নিয়ে বিকাশ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন অনুভব করেনি কখনও, কিন্তু ব্রিগসের জাতি বিদ্বেষ যে তাকে একটি দূষিত পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছিল, তাতে তার সন্দেহ নেই।

বদমেজাজী ব্রিগসের ফিরিঙ্গি বিদ্বেষের নানা কাহিনী হাসপাতালের অফিসারদের মুখে মুখে ফিরত। এর কারণ নিয়ে গবেষণাও করেছে কেউ কেউ, কিন্তু প্রকৃত কারণ কেউ জানতে পারেনি। বুথিডং বদলী হয়ে যাবার আগে শুধু বিকাশের কাছেই তিনি তাঁর জীবনের একটি অধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। সার্জারিতে বিকাশের প্রতিভা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভালবাসতেন ছোট ভাইয়ের মত।

ব্রিগসের সমস্ত জীবনটাই ভুল আর ব্যর্থতার কাহিনী। মেডিকেল কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন তিনি। ছাত্র অবস্থাতেই লণ্ডনে এক গায়িকার প্রেমে পড়েন, কিন্তু মেয়েটি এক আই-সি-এসকে বিয়ে করে ভারতে চলে আসে। মনের দুঃখে ব্রিগস ঢুকলেন মিলিটারীতে। ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে হংকংএ থাকবার সময় একটি এ্যাংলো চীনা পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। সে বাড়ীর একটি মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন। যুদ্ধের হিড়িকে বদলী হয়ে আসেন ভারতে। বউ থেকে যায় হংকংএ দুটী সন্তান সহ। সেখানে নতুন যে ব্রিটিশ ফৌজ এসেছিল, তাদেরই এক ব্রিগেডিয়ার তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে আফ্রিকায়।

শেষদিকে সারা দিনরাত মদে চুর হয়ে থাকতেন কর্ণেল ব্রিগস, কথাবার্তা বলতেন অসংলগ্ন। মদের ঝোঁকে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতেন, 'এ যুদ্ধ থামবে না মজুমদার, কিছুতেই থামবে না। মানুষের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে গেছে শত শত বছরের পাপ আর গ্লানি। রক্তের স্রোতে তা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে না গেলে আর আমাদের মুক্তি নেই। মানুষ তার আত্মাকে বেচে দিয়েছে বৈভবের কাছে। চারিদিকে খালি শয়তানী, বিশ্বাসঘাতকতা, লোভ আর কুটিল চক্রান্ত। যাবে, যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে এই যুদ্ধে, এ আমি বলে দিলাম।'

কখনও রিভলভার বাগিয়ে বলতেন, 'যুদ্ধ থামলে তুই

হাতে এমনি তুটো রিভলভার উঁচিয়ে যাবো। সেই তুশ্চরিত্রা নারীর রক্তে স্নান্ করে শান্তি পাবো।'

মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কান্নার সুরে বলতেন, 'আমার ছেলে তুটোকে ফিরিয়ে দেবে না মজুমদার? আমারই তো ছেলে, আমিই তাদের বাবা। সে থাকুক ব্রিগেডিয়ারের গৃহিণী হয়ে, কোনো ক্ষোভ নেই আমার। আমি কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না, কিন্তু আমার ছেলে তুটো! আমারও তো চাই কিছু! আমাকেও তো বাঁচতে হবে!' কিন্তু বেশীদিন বাঁচার ভাবনা ভাবতে হয়নি বেচারীকে। বুথিডংএ পৌঁছবার তিন দিন বাদেই খবর এসেছিল ব্রিগস "সসম্মানে নিহত" হয়েছেন। এ জন্মের মত তাঁর হয়ে গেছে যা হবার।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মর্মান্তিক বেজেছিল বিকাশের বুকে। তাঁর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন যুদ্ধের হিড়িকে ঘরছাড়া লক্ষ লক্ষ সৈনিকের অতৃপ্ত বাসনার প্রতীক। দেশ দেশান্তর থেকে আসা বহু অফিসারের সঙ্গে বিকাশের আলাপ হয়েছে। খাকীর পোষাক তাদের কারো পক্ষেই মানানসই নয়। সকলের মনেই বাসা বেঁধে আছে একটি শান্তির নীড়, কিন্তু সকলেই অশান্তির জীবন্ত প্রতিনিধি হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ময়দানে। জীবনের এ এক অদ্ভুত পরিহাস। ভাবতে বসলে তার মাথা ঘুরে যায়।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি হঠাৎ একদিন ভীষণ শীত পড়ল আম্বালায়। সকাল থেকে টিপটিপে বৃষ্টির সঙ্গে প্রচণ্ড হাওয়া বইতে সুরু করল। এমন দিনে নিতান্ত দায়ে না পড়লে লোকে পথে বেরোয় না। অফিস-আদালত, দোকান পশার জমতে চায় না আর স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পায় ছুটী। দরজা জানালা বন্ধ করে চুল্লীর ধারে গোল হয়ে বসে মেয়ে পুরুষে। ঘন ঘন চা খায় আর খোসগল্প করে। কবে কোথায় কে কত শীত ভোগ করেছে তারই অতিরঞ্জিত কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে।

ক্যান্টনমেন্টে সকলের প্যারেড বন্ধ থাকে। সৈনিকরা ব্যারাকে ব্যারাকে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পশমের খাকী পুলওভার পরে এসে বসে হুঁকো হাতে নিয়ে। কাঁচা তামাকের কল্কে ওড়ে ডজন ডজন। সুখ দুঃখ অতীত ভবিষ্যতের গল্পে মশগুল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কেউ গেয়ে ওঠে সিনেমায় শোনা কোনো গজল গান—'মালুম আগর হোতা, অঞ্জাম মহব্বৎকা—না দিলহি দিয়া হোতা'—। হাতের কাছে যে যা পায় তাই দিয়ে তাল দেয়।

অফিসার্স ক্লাবটা জমে যায় সকাল থেকেই, কারণ ওটা হল গরম হবার জায়গা। পেয়ালার টুংটাং আর চটুল নারীর চপল কণ্ঠ অপূর্ব সামঞ্জস্যের ঝঙ্কার তোলে। কাউণ্টারে শূন্য বোতলের পাহাড় জমে ওঠে, আর ভরে ওঠে ছাপাখানা থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা নোটের

তাড়ায় মেয়েদের লাল কালো রকমারী হাতব্যাগ গুলো। ক্লাবের ম্যানেজার হাসিমুখে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, ‘পৃথিবী যদি রসাতলে যায়, তাও জানবেন আমার ক্লাবে মেয়ের অভাব হবে না। অফিসারদের ‘পারিবারিক সঙ্গ দান করে মোরেল’ ঠিক রাখবার জন্য ওরা সব সময়ে উন্মুখ হয়ে আছে, সামান্য শীতে ওদের নিষ্ঠার অভাবে হবে—এও কি সম্ভব! ওরা হল সত্যিকারের দেশভক্ত নারী।’ দেশ বলতে তিনি সম্ভবতঃ ইংলণ্ডকেই বোঝাতে চান। সবাই জানে রঙটা কটা হলেও উনি তিন পুরুষ ধরে আম্বালা ক্যান্টন-মেণ্টেই বাস করছেন।

মেঘে মেঘে দুপুর বিকেল গড়িয়ে গেল সকলের অলক্ষ্যে। সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার এমন ঘনিয়ে উঠল যে ক্যান্টনমেণ্টের রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল পাঁচটার আগেই। ঝড়ের প্রচণ্ড উদ্দামতা দেবদারুর শাখায় আর ঝাউএর পাতায় পাতায় ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল। একটা অজানা আতঙ্কে সমস্ত ক্যান্টনমেণ্ট যেন মুহ্যমান।

ষ্টাফ কারে চেপে পাঁচটার পরই বাসায় ফিরল বিকাশ। চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল ছোটেলাল। তার পাশে দাঁড়িয়ে ধূমায়মান সেগারেট হাতে বিকাশ রেডিওর বোতাম ঘুরিয়ে কলকাতাকে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু পেল না। ঝড় জলের দিনে অতদূরের ষ্টেশন ধরা দিতে চায় না।

শীতটা খুবই কষ্টদায়ক, কিন্তু এই ঝড় বৃষ্টি অতি পরিচিত একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে বিকাশের মনে। তাই অন্যান্য দিনের চেয়েও তাকে বেশী প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। সিগারেটের ধোঁয়ায় শূন্যে রিং তৈরী করতে করতে তার মনে হল, সন্ধ্যাটাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত নয়। সকালে ছোট বোন মিট্টুর চিঠি পেয়েছে। ওভারকোটের পকেট থেকে চিঠিটা বার করে পড়ে নিল আর একবার। কোন এক শচীন রায় বেহালা শুনিয়ে মিট্টুকে এমন মুগ্ধ করেছে যে সে এখন সেতার ছেড়ে বেহালার সাধনায় আত্মনিয়োগ করার কথা চিন্তা করছে। 'ছোড়দা কোত্থেকে ধরে এনেছিল ভদ্রলোককে। উস্কোখুস্কো রুগ্ন চেহারা, বড় বড় চুল। মেয়েদের সঙ্গে আগে কখনও মেশে নি বোধ হয়। আমার সঙ্গে সহজ ভাবে কথাই বলতে পারছিল না—এমন লাজুক। কিন্তু বেহালায় যখন ছড় টানলো তখন সে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। আধ ঘণ্টা ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলাম সেই সুর। সমস্ত মন একেবারে অবশ হয়ে গিয়েছিল। শেষ হবার পর আরও দশ মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। ঘরের আবহাওয়ায় সেই সুরের মীড় তরঙ্গায়িত হয়ে দোল খাচ্ছিল। আমি যেন হারিয়ে গেছি সেই সুরে, আমার সত্তা বিলুপ্ত হয়েছে ধ্বনির নিবিড় গম্ভীরতায়............' উচ্ছ্বাসটা সন্দেহজনক রকমে বেশী। '...আজ সকালে উনি চলে গেলেন চাটগাঁয়, ভীষণ মন খারাপ লাগছে।

এখানে থাকলে নিশ্চয় ওর কাছে বেহালা শিখতাম।'— বিকাশের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। শচীন রায় নিশ্চয় এই মন খারাপের কথাটা জানে না। জানলে তার মনটাও ওর মত আনচান করত। চিঠির শেষ দিকে কলকাতার বর্তমান ছবি। 'দুর্ভিক্ষের পর থেকে সহরে এমন লোক বেড়েছে যে ধাক্কাধাক্কি না করে পথে চলা যায় না। মেয়েদের পক্ষে ট্রামে বাসে ওঠা তো প্রায় অসম্ভব। তারপর আবার দেশবিদেশের সৈন্য আর তাদের ভারী ভারী ট্রাক আর লরী। দুর্ঘটনা লেগেই আছে। কলকাতায় মানুষের জীবন বড়ো সস্তা হয়ে উঠেছে। রাত্রে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে এমন সব বীভৎস ঘটনা ঘটছে যা চিঠিতে লেখা যায় না। কবে যে এই যুদ্ধের শেষ হবে।' সব শেষে লিখেছে একান্ত গোপন কথাটা, 'অসুবিধা না হলে এ মাসে একটা বেহালা কেনার টাকা পাঠিয়ে দিও।'

মাইনে পেলেই পাঠিয়ে দেবে বিকাশ। বাপ মা হারা ছোট বোনের আবদার মেটাতে গভীর তৃপ্তি আছে। তার বাবা ছিলেন সরকারী ইঞ্জিনিয়ার। অল্প বয়সে ট্রেণ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার আগে কলকাতায় একটা ছোট বাড়ী করে রেখে গিয়েছিলেন। সেই বাড়ীর এক অংশ ভাড়া দিয়ে অতিকষ্টে তাদের তিন ভাই বোনকে মানুষ করেছেন বিধবা মা। তিনিও মারা গেছেন বছর চারেক আগে হার্টের অসুখে। মিট্টুর বয়স তখন চোদ্দ আর মেজভাই প্রকাশের

বয়স কুড়ি। এম-এ, পাশ করে প্রকাশ অধ্যাপক হয়েছে অর্থনীতির কিন্তু তাতে তার মন নেই। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির দিকে উগ্র ঝোঁক এবং তাই নিয়েই মেতে আছে। প্রকাশ মিট্টুকেও টেনে নিয়েছে তার দলে। দুই ভাই বোনে ঐ সবই করে বেড়ায়। ওসব দিকে ঝোঁকটা তারও কিছু কম ছিল না, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারের অভিভাবকত্ব তার উপর চেপে যাওয়ায় সংসার নিয়েই মাততে হয়েছে তাকে, নইলে কি আর মিলিটারীতে চাকরী করতে আসে কেউ ?

ছোটেলাল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। সেই ফাঁকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস হিমেল পরশ বুলিয়ে দিল তার চোখে মুখে।

'চা খাবেন সাহেব ?'

'জরুর, আভি লাও। চা না খেলে তো জমে যাব। তোমাদের এখানে বড় শীত।'

'এ আর কি বলছেন সাহেব, সিমলায় হয়ত বরফ পড়ছে।'

এখানেই বা পড়তে কতক্ষণ ? বিকাশের মনে হয়, বরফ কি আর এর চেয়েও কষ্টদায়ক হত ?

'আর শোন, চায়ের সঙ্গে তোমার তবলা জোড়াও এনো। গান বাজনা করে শরীর গরম করা যাক।'

'বহুত আচ্ছা সাব।'

ছোটেলালের সঙ্গে গীটার বাজানো মুস্কিল। তবলায় ওর হাত এত পাকা যে শেষ পর্যন্ত তালে তাল রেখে চলাই দুষ্কর হয়ে পড়ে।

চুল্লীতে সেঁকে সেঁকে ছোটেলাল গীটারের সুরে বাঁধতে লাগল তবলা। বিকাশের বিস্ময় লাগে। তবলা না বাজিয়ে বাবুর্চিগিরি করে কেন লোকটা? প্রশ্ন করে, কেন ছোটেলাল তবলা বাজানোটাকে পেশা না করে বাবুর্চিগিরি ধবল।

'এখানে কে শোনে আর কে বাজায় সাহেব? বাঈজীরা মাঝে মাঝে ডাকে, সখ করে বাজাই কিন্তু পয়সা নিতে পাবি না। অধর্মের পয়সা নিতে মানা ছিল বাবার। তার কাছেই শিখেছি কিনা। ঠিকাদার বচন সিং-এর হাতায় ফৈজাবাদের আখতারি বাঈ একবার নাচতে এসেছিল। এখানকার কোনো তবলচিকেই মনে ধরে না। শেষে আমি গিয়ে তবলা ধরলাম। বেচারী মাঝরাতে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে আমার কাছে মাফ চাইল। যাবার সময় আমাকে মাইনে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তখন চাকরী-বাকরী ছিল না, খুব অভাব তবু যেতে পারলাম না, ভাবলাম, শেষে বাঈজীর চাকর হব! সে আমি পারব না। আমার বাবা না খেয়ে মরেছিল তবুও তবলা বাজিয়ে পয়সা নেয়নি কখনও।'

ছোটেলাল অল্পভাষী কিন্তু গান বাজনার কথা উঠলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ও ব্যাপারে ওর আত্মাভিমান খুব বেশী।

শিল্পকলাকে ও পয়সার লেন-দেনের ব্যবসাদারী পরিধির মধ্যে টেনে নিতে রাজি নয়।

সুর বাঁধতে সময় লাগল অনেক। সাতটার ট্রেন চলে গেল হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে। রেল লাইন খুব দূরে নয়, বিশেষতঃ নিস্তব্ধ রাত্রে আওয়াজটা সহজেই কানে এসে বাজে।

'কি বাজাবো বলত ছোটেলাল?'

'বেহাগ শুনাইয়ে সাব। আপনার হাত খুব মিঠে।' স্বদেশী রাগ রাগিনী গীটারের তারে পরিষ্কার ওঠে না মোটেই। তবুও বিকাশ বেহাগের আলাপ সুরু করল। ছোটেলাল উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল তবলায় হাত রেখে। আলাপ শেষ হলেই সে আরম্ভ করবে।

সৌখীন বাজিয়ে বিকাশ, ছোটেলালের কাছে হার স্বীকারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আলাপ করতে লাগল। নির্জন সন্ধ্যায় প্রায় শূন্য গৃহে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেশ একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। ছোটেলাল মাথা নাড়তে লাগল চোখ বুজে।

আলাপ শেষ হবার আগেই একটা প্রচণ্ড আওয়াজে সুর কেটে গেল, গীটার পড়ে গেল হাত থেকে। হলঘরের দরজার কাঁচগুলো ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভরে উঠল ঘর। সেই বাতাসে ভেসে এল মানুষের চাপা আর্তনাদের কর্কশ শব্দ। তারা দুজনেই একসঙ্গে তাকালো দরজার দিকে, তারপর পরস্পরের মুখের দিকে। কয়েক

মুহূর্ত স্তব্ধ মৌন হয়ে বসে রইল। বিকাশ উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, ছোটেলাল হাত চেপে ধরল। তার চোখ আতঙ্কে বিস্ফারিত, ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভূত'।

'কি করে বুঝলে ?'

'আমি জানি সাহেব। আট মাস আগে এই বাড়ীতে এক মেমসাহেবের গলা টিপে মেরেছিল এক মেজর সাহেব। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না সে খবর। মাঝরাতে মেমসাহেবের লাশ ফেলে দিয়ে এসেছিল ইরিগেশান ক্যানালে। সেই মেম সাহেবের প্রেতাত্মা রোজ রাতে ঘুরে বেড়ায় হুজুর। আমি অনেক রাতে দেখেছি, বাগানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। দূর থেকে নমস্কার করে সরে যাই, মাঝে মাঝে তার কান্না শুনতে পাই।'

দরজার ওপাশ থেকে গোঙানীর একটানা আওয়াজ আসছে। এ গোঙানী মানুষের কণ্ঠ থেকেই উৎসারিত হতে পারে—যে মানুষ যন্ত্রণায় মৃত্যুর আভাস পেয়েছে।

বিকাশ হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। রিভলভারে গুলি ভরে সোজা এগিয়ে গেল দরজার কাছে। ভূত হোক, পেত্নী হোক, তাকে দেখবেই সে। যে অদেখা মেমসাহেবের প্রেতাত্মা দরজায় মাথা খুঁড়ে কাঁদছে তাকে সে বেশ ভাল করে পরখ করবে। ছোটেলাল ভয়ে কাঠ হয়ে দেখতে লাগল সাহেবের দুঃসাহসিক কীর্তি।

দেওয়ালে সুইচ টিপে বাইরের আলো জ্বেলে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল বিকাশ। সামনে তাকাতেই শিউরে উঠল তার সর্বাঙ্গ। জল কাদার মধ্যেই উবু হয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ে। সমস্ত কাপড়-চোপড় তার ভিজে সপসপ করছে। পাশেই একটা সুটকেশ আর হাতব্যাগ।

ছোটেলালের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল বিকাশ, 'ফওরাণ চলে আও, জানানা গির পড়ি।'

সে আহ্বানে ছোটেলালের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। 'জানানা' শুনেই তার সমস্ত চেতনা অসাড় হয়ে আসতে লাগল—নিশ্চয় সেই হতভাগ্য মেমসাহেব।

'কিঁউ জি, ডরনেকি কেয়া বাত হ্যায়? আও জলদি।' জলে ভেজা কাপড়-জামা-সুদ্ধ ঘরে ঢুকে বিকাশ ছোটেলালকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাইরে।

দুজনে ধরাধরি করে মেয়েটিকে চুল্লীর পাশে এনে শোয়ালো। বরফের মত ঠাণ্ডা দেহ তার অসাড় এবং কঠিন। প্রাণের স্পন্দন খুঁজে বার করতে অনেক ডাক্তারী কসরৎ ব্যয় করতে হল। হাঁকডাকে ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছে ছোটেলালের বউ লছমনিয়া। তাকে উদ্দেশ করে বিকাশ মেয়েটির ভিজে জামা কাপড় বদলে দিতে বলল। ছোটেলালকে পাঠাল হাসপাতালে কয়েকটি অষুধ আর সিরিঞ্জের জন্য। তারপর সারা রাত ধরে চলল জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত সঠিক বোঝবার উপায় নেই রোগটা কি। বিকাশের মনে হল শুধু ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার কেস নয় এটা, নার্ভাস ব্রেকডাউনও মিশে আছে তার সঙ্গে। নার্ভের শক্তি বাড়াবার গোটাকতক ইন্‌জেকশন দিয়ে গরম জলের বোতল লাগাতে বলে দিল লছমনিয়াকে।

অনেক উদ্বেগ আর উত্তেজনার অবসান করিয়ে শেষ রাতে জীবনের জয় সূচিত হল চোখের সুস্পষ্ট চাহনিতে।

আরও ভাল করে কম্বলগুলো ওর গায়ে জড়িয়ে দিল লছমনিয়া। ভিজে চুলের রাশি ছড়িয়ে দিল শাদা বালিসটার উপর। ব্রাণ্ডি মেশানো গরম দুধ খাওয়াতে লাগল ছোট চামচেয় করে আস্তে আস্তে ওর শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

ঘরের তিনটী সজীব মানুষের মুখে দেখা দিল খুসীর আমেজ। সবাই একবার করে সকলের দিকে তাকালো হাসিমুখে।

'কিঁউ ছোটেলাল, মদ কা মু'সে ওয়াপস লায়া হুঁ না। আগর আউর পনর মিনিট বাহার মে পড়ী রহতী তো বিবিজী খতম।'—বলল বিকাশ একটু গর্বের ভঙ্গিতে।

'ইয়ে তো খাস বাত হ্যায় সাহাব। লেকিন ম্যয় সোচতা হুঁ ইয়ে মেমসাব আয়ী কিধর সে? বড় তাজ্জব সাহেব বড় তাজ্জব। গহনাপত্র কাপড় চোপড় দেখে মনে হয় শরীফ ঘরের লেড়কি, কিন্তু এই ঝড় জলের রাত্রে এখানে উনি এলেন কেমন করে?'

তাই ত। প্রাণ সঞ্চারের উত্তেজনায় আসল কথাটাই ভুলেছিল এতক্ষণ। এই দুর্যোগের রাত্রে কোথা থেকে এসে উদয় হল মেয়েটি? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তাকালো ছোট-লালের দিকে। ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না।

'ভাল করে দেখ ছোটেলাল, ভূত নয় তো?'

ছোটেলাল সন্ধ্যার কথা স্মরণ করে লজ্জিতভাবে বলল, 'ভূত নাই হোক সাহেব, খুবসুরৎ জওয়ান লেড়কি...........

খুবসুরৎ অর্থাৎ রূপসী। নিজের অজ্ঞাতেই তার চোখ দুটি প্রতিফলিত হল মেয়েটির ক্লিষ্ট মুখের উপর। শুধু মুখ ছাড়া সমস্ত দেহটাই তার ঢাকা। শাদা বালিশের উপর ছড়ানো চুলের গুচ্ছ, শুভ্র মসৃণ কপাল, সুবিন্যাস্ত দুটি ভ্রূর নীচে আয়ত দুটি চোখ, ঠোঁট দুটো রক্তিম স্বাভাবিক লালিমায়, নরম মোলায়েম বাঁ গালের উপর আলো পড়েছে তেরছা ভাবে। সত্যিই হয়ত সুন্দরী মেয়েটি। বিকাশের বুকের রক্ত হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। মেয়েটি তার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। কিছু কি বলতে চায়? দুমিনিট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে আছে অজানা মেয়েটির কণ্ঠ থেকে কিছু শুনবার আগ্রহে, কিন্তু ওর ঠোঁট দুটো পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ, অসাড়। তারপর হঠাৎ নিমীলিত হল আঁখিপল্লব।

আরও দুমিনিট উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইল বিকাশ, কিন্তু যবনিকা উন্মোচিত হবার কোনো আশু সম্ভাবনার

আভাস নেই। বিকাশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অন্যদিকে ফিরল।

'সাহেব, রাত্রে আপনার খাওয়া হয়নি, খাবেন এখন?'

ছোটেলাল স্মরণ করাতে চায়। বিকাশ তাকালো তার দিকে। রাত্রে কেউই খাবার অবকাশ পায় নি। খাবার কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। লছমনিয়া গরম জলের বোতল ধরে বসে আছে মেয়েটির পাশে, সেইদিকে তাকিয়ে বিকাশের মায়া হয়। ঘুমকাতুরে লছমনিয়ার চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে দিয়েছে।

'তোমরাও তো খাওনি। এখন তো ভালই আছে মেয়েটি। লছমনিয়াকে নিয়ে খেয়ে এসো। আমি আর খাব না। এখন তো আবার অফিস যাবার সময় হয়ে এলো। বাকী রাতটা ইজিচেয়ারে শুয়েই কাটিয়ে দেবো।'

তাছাড়া উপায় নেই। বিছানা একটাই। নবাগতা সেখানে বেশ আরাম করেই দেহ এলিয়ে দিয়েছে। ইজি-চেয়ার ছাড়া শোবার জায়গাই বা কোথায়?

ছোটেলাল পাশের ঘরের চুল্লীতে আগুন জ্বালিয়ে ইজি-চেয়ার পেতে দিল তার পাশে। লেপ কম্বল যা ছিল সবই দখল করেছে অজ্ঞাত কুলশীলা। শুধু ওভারকোট গায়ে দিয়ে শুতে হবে। কাজেই চুল্লীর ধারে না শুয়ে উপায় নেই।

ওরা চলে গেল খেতে। বিকাশ ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। কিন্তু শুলেই কি ঘুম আসতে চায়! অজানা মেয়েটির

ক্ষণিকের বিমুগ্ধ চাহনি মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করেছে। নিদ্রার মত শান্ত ভীরুর স্থান হবেনা সেখানে। যে কথা কর্তব্যের তাড়নায় মনের তলায় চাপা পড়েছিল, সে হঠাৎ উঠে এসেছে মনের উপর। এই প্রচণ্ড শীত, ঝড় ঝঞ্ঝার ত্রাস মাথায় করে কার অভিসারে বেরিয়েছিল মেয়েটি? হাতের সুটকেসটা ভারী ছিল। স্বভাবতই মনে হয় বাইরে থেকে এসেছে, কিন্তু এত বাড়ী থাকতে তার বাড়ীর দরজায় কেন? কোন্ দেশী মেয়ে তাও বোঝা মুস্কিল। হাত ব্যাগটা খুললে হয়ত অনেক তথ্যই জানা যায় কিন্তু সে বড় অভদ্রতা হবে। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক ভাবে ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল বিকাশ। মেয়েটি হয়ত বাইরে থেকে এসেছে ট্রেণে। ওর তো আর জানা ছিল না যে আম্বালায় আজ এই রকমের দুর্যোগ! ষ্টেশনে নেমে টোঙ্গায় করে ওর গন্তব্য স্থানে যেতে চেয়েছিল। টোঙ্গাওয়ালা ভুল করে ওকে বে-ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে। শরীরটা হয়ত খারাপ ছিল। আসল বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে আরও কাতর হয়ে পড়ে। তারপর এই বাড়ীতে ঢুকে পড়েছে এবং শেষ মুহূর্তে কোলাপ্স করেছে। ঘটনাটা এছাড়া আর তো কিছুই হতে পারে না, বিশেষ করে মেয়েটি যখন অপরিচিতা। চেনা শোনা হলে না হয় অন্য ব্যাখ্যা হতে পারত। কিন্তু যতই সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করল, মনে মনে ততই যেন রহস্য আরও ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

ফলে ঘুমটা তার মাঠে মারা গেল।

পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের পেটা ঘড়িতে বাজল ছ'টা। বিকাশ লাফিয়ে উঠল। সাতটায় তাকে হাজির হতে হবে হাসপাতালে। পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে দেখল, খাওয়া দাওয়া সেরে লছমনিয়া এসে ঘুমন্ত মেয়েটির বিছানার উপরই মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে। মিলিটারী সাজপোষাক নিয়ে সে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। প্রতিদিনই সে এমন সময় স্নান সেরে নেয়। যতই শীত পড়ুক, বদ্ধ ঘরে স্নান করতে এতটুকুও কষ্ট হয় না।

পূরো ক্যাপ্টেনের পোষাক পরে যখন সে বেরিয়ে এল, তখন সাড়ে ছ'টা। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল আলোর আভা লেগেছে। বৃষ্টি যে কখন থেমে গেছে এবং ঝড় যে কখন উড়ে গেছে, টেরই পায় নি সে। বাইরের প্রকৃতিতে একটা ভিজে স্যাঁৎসেতে ভাব।

ওরা দুটী নারী ইলেক্ট্রিকের আলোর নীচে ঘুমোচ্ছে অঘোরে। মেয়েটির মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল বিকাশ। লজ্জা পাচ্ছিল সে। একেই বলে চুরি করে দেখা—স্বাভাবিক অবস্থায় যা শোভন নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মৃদু আন্দোলিত ওর ঘুমন্ত দেহে জীবনীশক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে! কানের নীল পাথরে আলো চিক্‌চিক্ করছে। ঘুমোবার এই সহজ ভঙ্গিতে কোথাও অস্বস্তি নেই। ও যেন বেশ আরামেই নিদ্রামগ্ন—প্রতিদিন এমনি করে এই বিছানায় ঘুমোয়।

দেখতে দেখতে বিকাশের মনে একটা আত্মতৃপ্তি জেগে ওঠে। মেয়েটি যে বেঁচে আছে,—এ নিতান্তই তারই অনুগ্রহ। মৃত্যুর মুখ থেকে ওকে ছিনিয়ে এনেছে সে। কোন পুরস্কারের লোভে নয়, মানবতার স্বাভাবিক প্রেরণায়। সারা রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, খেতে পারে নি, ঘুমোতে পারে নি, কিন্তু তবুও তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। নিজের মধ্যে সে গর্ব অনুভব করে। কোথা থেকে এলো মেয়েটি, কোথায় যাবে এবং কি ওর পরিচয় তা সে জানে না, কিন্তু অজানা-অচেনা লোকের জন্যও যে সে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, সেই চিন্তাটাই তার মনে আনন্দ এবং গর্বের ঢেউ তুলতে লাগল। আজকের এই স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে তাকে, হয়ত মেয়েটিকেও। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক একথা তো আর অস্বীকার করা যাবে না যে এই অবিস্মরণীয় স্মৃতির একক নায়ক কলকাতার বিকাশ মজুমদার !

পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বালল বিকাশ। তার মনে হল, সে কিছুই প্রত্যাশা করে না মেয়েটির কাছ থেকে। মনে রাখে রাখবে, ভোলে ভুলবে, তাতে তার কিছু আসে যায় না। নিজের মধ্যে সে অনুভব করতে পারছে নিজের মহত্ব,--ব্যাস্, এইটুকুই বেশ তৃপ্তি দিচ্ছে। তারপর আর যদি কিছু পাওয়া যায়, সেটা হবে উপরি পাওনা।

দরজার কাছে এগিয়ে এসে কপাট খুলল ঠেলে।

সামনেই চায়ের ট্রে হাতে ছোটেলাল—একেবারে অপ্রত্যাশিত।

'তুমি তাহলে ঘুমোও নি ?'

'আজ্ঞে না, আপনার ব্রেকফাষ্টের সময় হয়ে গিয়েছিল কি না।'

মামলেট জড়ানো রুটি মুখে পূরে গরম চা দিয়ে তাড়াতাড়ি গিলতে লাগল বিকাশ।

'দেখো ছোটেলাল, আমি ফেরার আগেই যদি সুস্থ হয়ে ওঠে মেয়েটি, তাহলে ও যেখানে যেতে চায় সেখানেই পৌঁছে দিও।'

'জি সরকার।'

'আর যাবার আগে ওর ভিজে কাপড়-চোপড় গুলো দিয়ে দিতে ভুলো না। মনে হয় বাইরে থেকে এসেছে, পথ ভুল করে বাড়ী খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমে গেছে। কাছাকাছি কোনো বাড়ীর মেয়ে হবে। যাই হোক, ওকে সাহায্য কোরো।'

'বহুত আচ্ছা সাব।

বিকাশ বেরিয়ে পড়ল।

সকালে সূর্য উঠল উড়ো উড়ো খণ্ড মেঘের ফাঁক দিয়ে। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিকাশ কমাণ্ডাণ্ট লেফ্‌টে-নাণ্ট কর্ণেল চৌবের সঙ্গে আলাপ করছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার থেকে তিনি টেলিফোন পেয়েছেন যে, বর্মা থেকে আসা দুশো আহত সৈনিককে অবিলম্বেই হাসপাতালে স্থান দিতে হবে। সাত দিনের মধ্যে তিনটি ব্যারাক খালি করে ফেলতে হবে। সে এক কঠিন সমস্যা, কারণ ইতিমধ্যেই হাসপাতালে স্থানাভাব, সমস্ত ঘর গুলোই একেবারে ভরে আছে। গরম কাল হলে কিছু লোককে হয়ত বারান্দায় চালান করা যেত, কিন্তু শীতে সেটা সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে তিনি এ্যাড্‌জুটাণ্ট মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন।

'কি করে সম্ভব হবে স্যার? এখানকার দুশো রোগীকে পাঠাবেন কোথায়?'

'জাহান্নমে।'—চৌবে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। 'এক কাজ কর মজুমদার, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর আর পেটের ব্যারামওয়ালাদের একটা লিষ্ট তৈরী করে ফেল এবং আজ বিকেলেই ওদের ডিসচার্জ নোটিশ দিয়ে দাও। এছাড়া অন্য উপায় নেই। হেড কোয়ার্টারের আদেশ তো আর অমান্য করা চলবে না। ওদের না হয় আউটডোরে চিকিৎসা করলেই হবে।'

'কিন্তু বহু সিরিয়াস কেস আছে······।

'মরুক তারা। মরতেই তো এসেছে। বিদেশ বিভূঁয়ে জাপানী বোমায় না মরে দেশের মাটিতেই মরুক।'

বিকাশ চৌবের দিকে তাকালো বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। চৌবে ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে একটু হেসে বললেন, 'তুমি ভাবছ আমি সিনিক, নৈরাশ্যবাদী এবং নিষ্ঠুরও। কিন্তু খাকীর সাজ পরে এছাড়া আর কি হতে পারে মানুষ? তুমি জান আজকাল ভাল করে লাঞ্চ খেতে গেলে একটা মানুষের আঠারো টাকার কমে হয় না অথচ এই যে লাখ লাখ ভারতবাসী দলে দলে এসে টিপসই দিয়ে জীবনটাকে বিকিয়ে দিচ্ছে গভর্ণমেণ্টের কাছে, ওদের সারা মাসের মাইনে আঠারো টাকা। যাদের জীবনের মূল্য মাত্র আঠারো টাকা, তাদের আবার চিকিৎসার দরকার কি? গামছা ছিঁড়ে গেলে কেউ কি রিপু করতে পাঠায় শালকরের বাড়ী? ভারতীয় সৈনিকদের আমি ঘৃণা করি, মশা-মাছির মত নিকৃষ্ট জীব বলে মনে করি। ওদের উপর আমার কোনো সহানুভূতি বা সমবেদনা নেই। ওরা হল জমিদারের ভাড়াটে লাঠিয়াল, আত্মা নেই ওদের। চাকরী করতে হয় তাই করছি, উপরওয়ালার হুকুম মানছি, ব্যাস আর কিছু নয়।'

বিকাশ জানে লেঃ কর্ণেল চৌবে মানসিক রোগে বিশেষজ্ঞ। মিলিটারীতে ওঁকে প্রথম ঢোকানো হয়েছিল সিভিলিয়ান উপদেষ্টা হিসেবে হেড কোয়ার্টারে। কিছুদিন

বাদে প্রধান সেনাপতির ব্যক্তিগত অনুরোধে মিলিটারী পোষাক পরেন এবং ওঁকে অস্থায়ী কর্ণেলের পদ দেওয়া হয়। '৪২ সালে ওঁর এক কলেজে পড়া ছেলে পুলিশের গুলিতে মারা যায় এলাহাবাদে। সে খবর হেড কোয়ার্টারে পৌঁছানো মাত্র ওঁকে হেড কোয়ার্টার থেকে সরিয়ে পদাবনতি করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতালে। এখন উনি যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত মিলিটারী ছাড়তে পারছেন না।

চৌবে হাসপাতাল ত্যাগ করলেন। এরিয়া হেড কোয়ার্টারে উচ্চপদস্থ অফিসারদের কনফারেন্স আছে সকালে। এখানে কিছু ইটালীয়ান যুদ্ধবন্দীকে আটকে রাখা যায় কিনা সে সম্বন্ধে মতামত চেয়ে পাঠিয়েছে দিল্লী থেকে। সম্মেলনে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিকাশ নিজের কামরায় ঢুকে জমাদার ফতেসিং-কে ডেকে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর আর পেটের ব্যারামের রোগীদের লিস্ট তৈরী করতে বলল। ওদের হাসপাতাল থেকে সরানো যে কি মুস্কিল হবে তা সে অনুভব করতে পারে। কয়েকজন তো মুমূর্ষু, সরানো যাবে কিনা সন্দেহ। চৌবের কথাগুলো তার মনে হতে লাগল। মাত্র আঠারোটি টাকার বিনিময়ে ওরা ওদের জীবনটাকে তুলে দিয়েছে বিদেশী শাসকের হাতে—আশ্চর্য লাগে ভাবতে। 'শত মুক্তাধিক আয়ু কাল সিন্ধু পানে তুই ফেলিস পামর'।—

বিকাশের মনে হয় এ লড়াইতে এসে ওদের আত্মাহুতি দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। কার জন্য লড়তে এসেছে ওরা, নিজেদের জীবনের বিনিময়ে কাদের জীবন ধন্য করতে চায়, কোন মহৎ আদর্শ হাতছানি দিয়েছে ওদের ? কেউ নয়, কিছু নয়। তবু ওরা আসছে দলে দলে। পাঞ্জাব আর যুক্তপ্রদেশের গাঁ কে গাঁ উজাড় করে এসে ভর্তি হচ্ছে ফৌজে, এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। ওরা দেশের নেতাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, জানে তাঁরা এই যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করতে নিষেধ করেছেন, কেউ কেউ '৪২ এ পুলিশের লাঠিও খেয়েছে, কিন্তু তবুও ওরা ভীড় জমাচ্ছে রিক্রুটিং সেণ্টারে। সত্যিই কি ওদের আত্মা নেই ? হঠাৎ তার মনে হয়, আত্মা যদি ওদের না থাকে তাহলে তারও নেই। সেও তো ইংরাজের শাসনের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তাহলে সে কেন স্বেচ্ছায় ঢুকেছে মিলিটারীতে ? যুক্তি একটিই আছে, টাকা চাই—সংসারের জন্য, ডিসপেন্‌সারী বসাবার জন্য। সহজে টাকা জমাবার সুবিধে পাবে বলেই তো সে পরেছে মিলিটারী পোষাক। এর পেছনে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদ ছাড়া কোনো মহৎ আদর্শ নেই। সেই একই নীতি হয়ত ওদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মূল্য মানের ভিত্তিতে আঠারোটি টাকার যত কম দামই হোক, ওদের জীবনযাত্রায় নিশ্চয়ই তার মূল্য খুব বেশী। একটি দুর্ভিক্ষে যে দেশে তিরিশ লক্ষ লোক মরে গেল নীরবে, সে দেশে

নিজের জীবন বাজী রেখে আঠারোটি টাকা আদায় করা খুব অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হল না তার।

বিকাশ আর্মি অর্ডারের পাতা উল্টাতে লাগল। সিস্টার ম্যাকল্যাগেন এসে ঘরে ঢুকলেন। উনি বলেন, উনি নাকি খাস বিলিতি মেম, যুদ্ধের চাকরীতে এসেছেন। বয়স ত্রিশের নীচে। দেখতে শুনতে ভালোই। তবে ওঁর হিন্দী উচ্চারণ এত পরিষ্কার যে অনেকেই বলে উনি এদেশেরই ফিরিঙ্গি, মর্যাদা বাড়াবার জন্যে 'খাস বিলিতি' বলে নিজের পরিচয় দেন।

'আসুন সিস্টার—বসুন অনুগ্রহ করে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ক্যাপ্টেন।'—হাসিমুখে চেয়ারে বসে বিকাশের কৌটো থেকে একটা সিগারেট বার করে জ্বালালেন সিস্টার। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কাল থেকে এক ল্যান্স নায়েক এসে এমন চেল্লাচ্ছে যে তিন নম্বর ব্যারাকে অন্য রোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।'

'কি হয়েছে তার?'

'হবে আর কি, যা হয়। কুচকীতে ফোড়া হয়েছে। ওকে অবিলম্বে অপারেশন না করলে অথবা অন্যত্র না সরালে তিন নম্বর ব্যারাকের রোগীরা বিদ্রোহ করবে।'

'কুচকীর ফোড়া শুনে তো মনে হচ্ছে যৌন ব্যাধির কেস। ওকে ওখানে পাঠালো কে?'

'না পাঠিয়ে কি করবে বলুন। যৌন ব্যাধির ঘরে কি আর একটা সিটও খালি আছে?'

কথাটা ঠিকই বটে। যৌন ব্যাধির ব্যারাক দুটো ভরে রয়েছে বলে অনেক রোগীকে আউটডোরে চিকিৎসা করা হচ্ছে। এ হাসপাতালে অর্ধেক রোগীই ভোগে ঐ অসুখে। ভারী অদ্ভুত ব্যাপার!

'আচ্ছা, আমি দেখছি।'

ক্যাপ্টেন সুব্রামানিয়াম কে ডেকে পাঠালো বিকাশ। যদি অপারেশন চেম্বার খালি থাকে, তাহলে ওকে দিয়েই কাটাবে। কিন্তু সুব্রামানিয়াম রাজী হলেন না। বললেন, 'শীতে হাত জমে আছে, ছুরি ধরতেই পারব না।'

'খুব সহজ অপারেশন।'

'অসম্ভব এ্যাড্‌জুটান্ট, আজকে একদম সম্ভব নয়।'

অগত্যা বিকাশকেই বেরুতে হল। তিন নম্বর ব্যারাকের বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছে উৎকট চিৎকার। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই ওকে দেখে লোকটা হঠাৎ চুপ মেরে গেল।

বিকাশ তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'কেয়া হুয়া তুমারা?'

'বহুত দরদ সাব, বহুত দরদ।'

'বুঝলাম, দেখি কোথায় ব্যথা।'

গায়ের কম্বলটা সরিয়ে ফোড়াটা দেখালো বিকাশকে। না দেখালেও ক্ষতি ছিল না। হাসপাতালে কুচকীতে ফোড়া নিয়ে যারা আসে, তারা একটি মাত্র রোগেই ভুগছে এবং তার একটিমাত্র অষুধই আছে—ছুরি চালানো।

'নাম কেয়া তুমারা ?'

'ল্যান্স নায়েক প্রীতম সিং।'

'ফৌজে ঢুকেছ কতদিন ?'

'দো সাল হোগা হুজুর।'

'বাজার কী ছোকরীওঁকো পাশ কিঁউ যাতে হো ? সরম নেহি আতী ?'

লোকটা হঠাৎ হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। 'মাফি মাঙতা হুজুর, এক দফে মাফ কর দিজিয়ে মুঝে। আউর কভি এইসা নেহি হোগা।'

'ঘর কাঁহা ?'

'সাহারাণপুর।'

'বাড়ীতে আছে কে ?'

'সব আছে সাহেব। বউ, মা, বাবা, ভাই, বোন।'

'ফৌজে ভর্তি হবার আগে কি করতে ?'

'ক্ষেতে কাজ করতুম, কিন্তু তাতে পেট চলেনা বলে ফৌজে ঢুকেছি।'

মিস ম্যাকল্যাগেন পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। বিকাশ তাঁকে বলল, 'এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন অপারেশন চেম্বারে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি।'

ব্যারাক থেকে বাইরে এসে বিকাশ ভাবতে লাগল,—যুদ্ধ ফেরৎ এই সব যৌন ব্যাধিগ্রস্ত সৈনিকরা সহর এবং গ্রামাঞ্চলে কি রকম ব্যাধির নরক ছড়াবে। প্রীতম সিং

থেকে তার বউ এবং ছেলেমেয়ে এবং তারপর পুরুষানুক্রমে টানতে হবে এই ক্ষণিক উত্তেজনার মর্মান্তিক জের।

মিলিটারীতে যৌনব্যাধি বিশেষ ধরণের গৌরবের স্থানই অধিকার করে রয়েছে। ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্য যে সমস্ত কড়া আইন তৈরী করা হয়েছে সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে না মানলে সৈন্যদের শাস্তি পেতে হয়। জামার হাতা না গোটালে হয়ত একদিন আটক থাকতে হবে, মশারি না টাঙালে কোর্ট মার্শাল। কিন্তু যৌন ব্যাধির কোনো শাস্তি তো নেই-ই বরং নির্দেশ আছে যে, যৌন ব্যাধির ব্যাপার নিয়ে কেউ যেন ওদের ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে বা ধমক ধামক না দেয়। যৌন ব্যাধি চিকিৎসার ব্যবস্থাও ভাল। কর্তারা ধরেই নিয়েছেন যে সৈন্যরা অস্থান কুস্থানে যাবে এবং ব্যাধিগ্রস্ত হবে। তাই ব্যাধি-মুক্তির ব্যবস্থার দিকেই নজর দিয়েছেন বেশী। এই ব্যাপারে ডিসিপ্লিনের কোনো কড়াকড়ি নেই। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই যে,—সৈন্যরা পরিবার ছেড়ে ঢুকেছে এসে ফৌজে কিন্তু যেখানেই তারা থাকুক, দেহের তাগিদটা সঙ্গেই রয়েছে। কাজেই ওসব নিয়ে বেশী কড়াকড়ি করে ওদের 'মোরেল' ভেঙ্গে দেবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, যে মরতে চলেছে, তাকে মরার আগে একটু 'উপভোগ' করতে দাও না। মেয়েদের তাঁরা পুরুষের ভোগের বস্তু মনে করেন। এসব কথা কোনো মিলিটারী কানুনে লেখা নেই কিন্তু সবাই জানে। বিকাশও জেনেছে বেশ ভাল করে গত কয়েক মাসে।

অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তার লাভ নেই। সে স্থায়ী-ভাবে চাকরীতে ঢোকেনি বা মিলিটারীকে সংস্কার করতেও আসে নি। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নেবে। কয়েক হাজার টাকা চাই। একটা ভাল ডিস্‌পেন্‌সারীর খরচ। ব্যাস।

তবুও ভাবনা আসে মাঝে মাঝে। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য রাখবাব জন্য কামানের খোরাক সংগ্রহ করছে এদেশ থেকে। শুধু তাই করে যদি ক্ষান্ত থাকত তাহলে কথা ছিল না, কিন্তু তারা সমগ্র জাতিটাকে কলুষিত করছে। নৈতিক অধঃপতনের পিছল পথে মৃত্যু এবং নরকের দিকে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অপারেশন শেষ হবার পর বাথরুমে গিয়ে হাতে সাবান ঘষতে ঘষতে নজর পড়ে গেল ঘড়িটার দিকে। বারোটা ইতিমধ্যেই বেজে গেছে। এবার বিকাশ বাঙলোয় যাবে লাঞ্চ খেতে। কিন্তু কি আশ্চর্য, কাজের চাপে গত রাত্রির ঘটনাটা একদম ভুলে বসেছিল। তা'র বুকটা নেচে উঠল। মেয়েটি সম্ভবতঃ এতক্ষণ বাড়ী গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগাচ্ছে, কিন্তু যাবার সময় কি বলে গেল কে জানে! তার মন উৎসুক, আগ্রহশীল হয়ে উঠল। বাইরে ষ্টাফ কার দাঁড়িয়েছিল, তাতে চড়ে বাসায় রওনা হল সে।

গাড়ী থেকে নামতেই চোখে পড়ল, ছোটেলাল গেটের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছুটে এসে সে ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিল।

'খবর কি ছোটেলাল, চলী গয়ী ক্যা ?'

'নেহি সাব। আভিতক তো শো রহী হ্যায়।'

বিকাশ শঙ্কার দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। এখনও শুয়ে আছে ? তাহলে কি অন্য কোন অসুস্থতা আছে ?

'সকালে তো দারুণ মুস্কিলে পড়েছিলাম সাহেব। লছ-মনিয়া এসে বলল, মেম সাহেব ঘুম থেকে জেগেছে কিন্তু কোন কথার জবাব দিচ্ছে না। আমি ভাবলাম, বোবা হবে বোধ হয়। নিজে গিয়ে কথা বললাম, তখন বুঝলাম উনি আমাদের ভাষা বোঝেন না। এ দেশী লোক নয় সাহেব। লছমনিয়া বলছে বাঙালী হতে পারেন।'

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ল, 'বাঙালী' ?

'কে জানে সাহেব, বুঝতে পারিনি। তবে খুব খিদে পেয়ে ছিল নিশ্চয়ই। দুটো ডিম, একটা রুটী আর দুকাপ চা খেয়েছেন ব্রেক ফাষ্টে। নিজের হাতেই খেয়েছেন, কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠেন নি।'

কথা বলতে বলতে তারা ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। মেয়েটি তাকালো তাদের দিকে। তাকে উদ্দেশ করে বিকাশ হেসে বলল, 'হ্যাল্লো !'

কোন সাড়া পেল না। বিকাশ তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করবার জন্য সাগ্রহে তুলে নিল বাঁ হাত খানা। খাঁটি বাঙালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নাকি বাঙলা দেশের মেয়ে, সত্যি ?'

বিকাশের মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে তার হাসিটাকে মুছে দিল মেয়েটি। নিজের অপ্রতিভতা ঢাকবার জন্য বিকাশ তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে প্রশ্ন করল, 'আপনি বাঙালা দেশ থেকে এসেছেন কি?' মেয়েটি মাথা নেড়ে জানালো সে বাঙলা থেকে আসে নি।

'তাহলে ইংরাজি বোঝেন আপনি?'—হাতটাকে বিছানায় রেখে দিয়ে বিকাশ প্রশ্ন করল।

এবারেও সে মাথা নেড়েই জানালো– সে বোঝে।

'বিছানা ছেড়ে উঠছেন না কেন, দুর্বলতা অনুভব করছেন?'

'ইয়েস, ভেরি মাচ্।'

এই প্রথম ওর কণ্ঠ দিয়ে শব্দ উচ্চারিত হল। সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর নয়, বাষ্পাচ্ছন্ন মৃদু আওয়াজ।

'কিন্তু আপনার শরীরের অবস্থা তো খুব ভাল। আমার মনে হয় আপনার মনই দুর্বলতায় ভুগছে। খুবই স্বাভাবিক অবশ্য। গতকাল যে বিপর্যয় গেছে আপনার উপর দিয়ে। চেষ্টা করে দেখুন না, উঠতে পারবেন বোধ হয়।'

'পারবো?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি ওঠবার আগে বলুন তো কোথায় আপনার বাসা? অন্ততঃ একটা খবর তো পাঠানো উচিত। তাঁরা হয়ত আপনার খবর না পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।'

সে কোন উত্তর দিল না। চোখ নামিয়ে এক মিনিট চুপ থেকে বলল, 'আমি এসেছি বাইরে থেকে।'

'তাতো বুঝতেই পেরেছি কিন্তু কোথায় যাবেন বলুন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন যে আপনি একজন অপরি-চিতের বাসায় শুয়ে আছেন।'

'লোকটা অপরিচিত, কিন্তু বাসাটা নয়।'

বিকাশ ঘাবড়ে গেল হঠাৎ। এ কথার মধ্যে কি হেঁয়ালী আছে? একটু ভাবতে হল তাকে।

'আমি এই বাঙলোর ঠিকানা নিয়েই আম্বালায় এসে-ছিলাম, কিন্তু যাকে দেখব বলে আশা করেছিলাম, তাকে দেখতে পাচ্ছি না।'—বলল মেয়েটি।

'অসম্ভব। গত কয়েক সপ্তাহ আমিই বাস করছি এই বাঙলোয়। আমি ছাড়া আর কাউকে এখানে দেখবার আশা করতে পারেন না। আমি একলাই থাকি।'

'তাইত আশ্চর্য লাগছে।'

'আমারও। কোথা থেকে এসেছেন, তা জানতে পারি কি?'

হঠাৎ মেয়েটির মুখটা মলিন হয়ে উঠল, বলল, 'নিশ্চয়ই পারেন, কিন্তু প্লিজ, আপনার কাছে বিনীত প্রার্থনা, আজকের দিনটার মত আমাকে কোন প্রশ্ন করবেন না। আমার শরীর মন অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় আছে, সব কথা ঠিকমত বলতে পারব না হয়ত।'

'বেশ ত, যা ভাল বোঝেন তাই করুন। কিন্তু আপনি আজ থাকবেন কোথায় ?'

'কেন ? আমাকে এখনই তাড়িয়ে দিতে চান নাকি ?'—মেয়েটি করুণ দৃষ্টিতে তাকালো বিকাশের মুখের দিকে।

বিকাশ লজ্জায় পড়ল। তাড়াবার প্রশ্ন নিশ্চয়ই ওঠে না, কিন্তু একলা বাড়ীতে তার সঙ্গে মেয়েটির থাকা মোটেই শোভন হবে না। সে প্রশ্ন তুলতে তার সঙ্কোচ হল, বলল, 'তাড়াবার কথা তো হচ্ছে না। যদি থাকেন, তাহলে এখনই সে রকম ব্যবস্থা করতে হবে কি না। কিন্তু আপনি যে এখানে থাকবেন, আমি কিন্তু একলা থাকি। অস্বস্তি বোধ করবেন না তো ?'

মেয়েটি কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল, 'উপায় কি বলুন। এ সহরে আর কাউকে তো চিনি না। আপনি তাড়িয়ে দিলে রেল ষ্টেশন ছাড়া আর কোথাও যাবার কথা তো মনে আসে না।······তাছাড়া এতবড় বিরাট বাঙলো, অস্বস্তিরই বা কি আছে ?'

'বেশ। সেই ভালো, এখানেই থাকুন, কিন্তু এখন একবার ওঠবার চেষ্টা করুন। পারবেন, নিশ্চয় পারবেন।'

'তাহলে—তাহলে···যদি কিছু মনে না করেন, দয়া করে একটু পাশের ঘরে বসুন। আমি পোষাকটা বদলে নেবো।'

বিকাশ পাশের কামরায় না ঢুকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। নানা চিন্তায় গম্ভীর হয়ে উঠল মুখটা। এ মেয়ের

অকস্মাৎ আবির্ভাবের পেছনে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। এই বাঙলোর ঠিকানা নিয়ে এসেছে, অথচ যার কাছে এসেছে, সে বিকাশ মজুমদার নয়। ভারী অদ্ভুত! কোনো ষড়যন্ত্র আছে কি না, তাই বা কে জানে? মেয়েটি যে কোন্ দেশী তাই ধরতে পারছে না। ওর কথাবার্তা আচার-আচরণ সবই এত অস্বাভাবিক, এত অপ্রত্যাশিত যে, বিকাশ মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। মেয়েটির মধ্যে আত্মগোপনের একটা প্রয়াস আছে। ও-যে নিজের সম্বন্ধে আজ কিছুই বলতে চাইছে না এবং এক রকম জোর করেই এ বাড়ীতে থেকে গেল—এটাই তাকে অস্বস্তিতে ফেলল। অবশ্য এ ছাড়া উপায়ও নেই। অন্যমনস্কভাবে বারান্দায় পায়চারী করতে করতে অনেক রকমের বিপদের আশঙ্কায় মনটা তার বেশ একটু দুর্বল হয়ে পড়ল।

ভাবতে ভাবতে দরজার সামনে আসতেই হঠাৎ দরজাটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল। তারপর একসঙ্গে উন্মুক্ত হল দু'টো কবাটই। সেদিকে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই তার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরায় চাঞ্চল্যের তরঙ্গ বয়ে গেল। সদ্য সাজ-পোষাক বদলে দরজার কবাটে হাত রেখে দাঁড়ানো মেয়েটি আঁকা ছবির মত সুবিন্যস্ত। চোখে মুখে বেদনার সুষমা, শুকনো ঠোঁট, রুক্ষ চুলের রাশি বাতাসে উড়ছে ফুরফুর করে, দেহটি জড়ানো হাল্কা নীল রঙের শাড়ী ব্লাউসে। সমস্ত চেহারার মধ্যে অপূর্ব মায়ার পরশ। চোখ ফেরানো যায় না।

'আসুন'—ওর মুখে একটা হাসির রেখাই ফুটল বোধ হয়। এ আহ্বান যেন আমন্ত্রণ। বিকাশের মাথা ঘুরে ওঠে। নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পেছনে পেছনে ঘরে গিয়ে ঢোকে সে।

খাবার টেবিলে চেয়ার পাতা ছিল। তারই একটা টেনে নিয়ে বিকাশ বলল, 'এই তো বেশ হাঁটছেন আপনি। একটু আগে বিছানা ছেড়ে উঠতেই ভয় পাচ্ছিলেন!'

'তাই তো দেখছি। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে।'—মৃদু হেসে জবাব দিল মেয়েটি।

'এবার বলুন ব্যাপারটা কি, আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করছি।'

মেয়েটি ফিরে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত বিকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন পড়বার চেষ্টা করল তার মুখের রেখায়। তারপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, 'আমি জানি। অস্বস্তি বোধ করাই স্বাভাবিক।···আর আমিও ভেবে দেখলাম, আপনার কাছে কিছুই আমার গোপন করার নেই। আমি এসেছিলাম···এসেছিলাম ক্যাপ্টেন ব্রিজনারায়ণ খোসলার কাছে। চেনেন তাকে?'

অনেক ভেবেও ব্রিজনারায়ণ খোসলাকে চিনতে পারল না বিকাশ। প্রশ্ন করল, 'কোন সার্ভিসের বলুন তো?'

'মেডিক্যাল কোর।'

'চিনতে পারছি না। অন্ততঃ আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে কেউ আছেন বলে মনে হচ্ছে না।'

অস্পষ্ট একটা কাতরোক্তি করে মেয়েটি বলল, 'নেই কেউ ?'

'উঁহু। আমিও মেডিক্যাল কোরের অফিসার। আম্বালায় ও-নামে কোনো অফিসার নেই। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কেউ ছিল না।'

'কেউ ছিল না!'—হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নীচু করল মেয়েটি।

ছোটেলাল খাবার এনে সাজিয়ে দিল টেবলে। গুম হয়ে বসে থাকা মেয়েটিকে বিকাশ বলল, 'খান।'—

চামচ তুলে নিল মেয়েটি। উত্তেজনাময় নীরবতায় কাটল আরো কয়েকটি মুহূর্ত। ওর ব্যর্থতায় ভেঙে পড়া ভাবটা বিকাশেব দৃষ্টি এড়ায় নি। সান্ত্বনার সুরে বলল, 'অবশ্য একেবারে সঠিক খবর জানি না। তবে এখানে কোন ক্যাপ্টেন খোসলাকে আমি দেখি নি। হয়ত তিনি সুদীর্ঘ ছুটিতে আছেন, কিংবা হয় ত অন্য কিছু। অন্ততঃ খুঁজে দেখা যেতে পারে এরিয়া হেড্ কোয়ার্টারে। কিন্তু আমি আপনার পরিচয় জানতে উৎসুক। ক্যাপ্টেন খোস্‌লা আপনার কে হন ?'

মাথা নীচু কবে প্লেটে চামচ ঘষছিল মেয়েটি। মুখ তুলে তাকালো সলজ্জভাবে। চোখে মুখে তার বাষ্পের আভাস।

বিকাশের ভয় হল, হয়ত কেঁদে ফেলবে এক্ষুণি। কিন্তু তার চোখে জল দেখা দিল না। তার মনে হল খুব কঠিন ভাবেই মেয়েটি নিজের একটা আবেগকে চেপে রেখেছে।

'আমি এসেছি বোম্বাই প্রদেশ থেকে। জাতে মারাঠী, নাম অনুসূয়া পরাঞ্জপে। খোসলা আমার কে—সে প্রশ্ন বড় কঠিন। জবাব দিতে অনেক সময় লাগবে। তবে আমি এখানে এসেছি তারই খোঁজে এবং তাকে আমার খুঁজে বার করতেই হবে। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে, মৃত্যুর অন্ধকার যখন আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আপনার মত একজন সহৃদয় লোকের আশ্রয় পেয়েছি। যা পেয়েছি তা অবিস্মরণীয়।'

'স্-স্-স্-স্, কবিতার মত শোনাচ্ছে।'—বিকাশ ওকে অপ্রতিভ করে হেসে উঠল, 'খাওয়া বন্ধ করে অপরের গুণগান করা ঠিক নয়, বিশেষ করে যাকে এখনও ভাল করে চেনবার অবকাশ পাননি। এখন বলুন তো কাল এখানে এলেন কি ভাবে? খোসলা পাঞ্জাবী আর আপনি মারাঠী। ব্যবধান তো প্রায় দুই মেরুর। দু'জনের আলাপ পরিচয় ঘটল কি করে?'

আবার কিছুক্ষণ মৌন হয়ে বসে রইল মেয়েটি। প্রশ্ন-গুলো এমন ভাবে আসে যে কোনটা এড়িয়ে কোনটার উত্তর দেবার উপায় নেই। সব প্রশ্নেই একেবারে মূল ধরে টান পড়ে।

বিকাশের ঔৎসুক্য বাড়তে বাড়তে অধীর হয়ে উঠেছে। এ মেয়ে বেপরোয়া হয়ে সাংঘাতিক কিছু একটা করে ফেলেছে বুঝতে তার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। বিরাট এক রহস্যের নায়িকার মুখোমুখি বসে দুর্বোধ্যতার আবহাওয়া যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে তার কাছে। যেকথা প্রকাশ করতে বাধছে মেয়েটির, সে কথা এই মুহূর্তেই তাকে জানতে হবে, নইলে শান্তি নেই। তবুও নিষ্ঠুর হতে চায় না সে। সহানু-ভূতিব সুরে বলল, 'আমার কাছে আশ্রয় পেয়ে যদি সুখী হয়ে থাকেন, তাহলে এও জেনে রাখুন, নিজের কথা অকপটে প্রকাশ করলে আমার দিক থেকে আপনার কোন ক্ষতিব আশঙ্কা নেই। যদি কোন বড় রকমের সমস্যায় পড়ে থাকেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে বলুন। আমি সাহায্য করব। আমি আপনার শত্রু নই।'

'আমি জানি, তা আমি জানি। কাল থেকে আপনার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আর যাই ভাবি আপনাকে, শত্রু ভাবতে পারব না কখনও। জীবনে অনেক মুহূর্ত আসে যখন জীবনটাকেই দুর্বিসহ মনে হয়, মানুষকে মনে হয় অমানুষ। মৃত্যু তখন একান্ত কাম্য। তেমনি মুহূর্তই এসেছিল আমার জীবনে। আপনার সহৃদয় সহানুভূতি আমাকে যেন হঠাৎ জীবনের প্রতি আগ্রহশীল করে তুলেছে। আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না, অবশ্য গোপন করার কিছু নেইও আমার,······খোসলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল

সেকেন্দ্রাবাদে। আমি সেখানকার স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিলাম। মাস দুয়েক আগে সে হঠাৎ সেকেন্দ্রাবাদ ত্যাগ করে। আসবার সময় বলে এসেছিল ফিল্ড সার্ভিসে যাচ্ছে। কোথায় যাবে তা নাকি সে নিজেই জানত না। বলেছিল, গন্তব্যস্থানে পৌঁছে ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখলে আমি যেন তাকে চিঠি দিই। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এ পর্যন্ত একটি চিঠিও তার পাই নি।'

বিকাশ একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে—তাহলে—আপনার সঙ্গে খোসলার একটা ব্যক্তিগত বোঝাপড়া হয়েছিল?'

'সেটা বুঝতেই পেরেছেন—আমার ভয় হয় খোসলা হয়ত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে—।'

তার চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বিকাশ চুপ করে রইল। কিন্তু তার মুখের ভাবে প্রকাশ পেল অনেক কিছুই যেন সে বুঝে ফেলেছে সামান্য আলোচনায়। এই মেয়েটি সুদূর হায়দ্রাবাদ রাজ্যের একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। সেখানে খোসলা নামে একটি মিলিটারী অফিসার গিয়ে হাজির হয় এবং তার সঙ্গে এর হৃদয়ের বিনিময় হয়েছিল। তারপর খোসলা একদিন নিরুদ্দেশ, তাই তার খোঁজে বেরিয়েছে মেয়েটি। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে আম্বালায় এবং এই বাঙলোয় এসে জুটলো কি করে?

'....সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি তার চিঠির অপেক্ষায় দিন গুনেছি। তার দেশ, বাড়ী, মা বাপ কারো ঠিকানাই জানি না যে খোঁজ-খবর করব।'

'এ ঠিকানা পেলেন কি করে?'—তার কথা শেষ না হতেই প্রশ্ন করল বিকাশ।

'এ ঠিকানা ছিল তার একটা বইতে। একবার ভুল করে একখানা বই সে রেখে গিয়েছিল আমার কাছে। সেই বইয়ে বুকমার্ক দেওয়া ছিল একটা ব্যবহৃত খামে। তাতে তার নাম এবং এই ঠিকানাটা লেখা ছিল। মরিয়া হয়ে আমি সেই ঠিকানা নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম এটা হয়ত তার বাড়ী। মনে একটু সন্দেহ দানা বেঁধেছিল বলে ইচ্ছে করেই চিঠিপত্র না লিখে হঠাৎ এসেছি। এখানে এত শীত আমার ধারণা ছিল না। তার উপর পথে দারুণ ভীড়। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়েছিল। শেষে টোঙ্গাওয়ালা যখন ঠিকানা দেখিয়ে নামিয়ে দিল, তখন আমার চলবার ক্ষমতা নেই। কোন মতে এসে দাঁড়ালাম আপনার দরজায়। ভিতরে খাকী রঙের পোষাকে আপনাকে দেখে আনন্দ হয়েছিল অপূর্ব। হঠাৎ আপনার চেহারাটা নজরে পড়ল। দেখলাম আপনি সে লোক নন। সেই মূহূর্তে মাথাটা এমন ঘুরে গেল যে আমি টাল সামলাতে না পেরে সুটকেশ শুদ্ধ আপনার দরজায় হুমড়ী খেয়ে পড়ি। তারপর শেষ রাত্রে আমার জ্ঞান ফিরে আসে।'

'ও-হো, এ ঠিকানা যে কারও স্থায়ী ঠিকানা হতে পারে না, এটুকু বুঝলেন না। এতো মিলিটারী বাঙলো। যখন যে অফিসার ভাড়া নেয় তখন তার। তবে তার বইতে যদি এই ঠিকানা লেখা থেকে থাকে, তা হলে খোঁজ করা সহজ হবে। দাঁড়ান ছোটেলালকে জিজ্ঞাসা করে দেখি খোসলাকে চেনে কিনা।'

ছোটেলাল চেনে খোসলাকে। বছর দুয়েক আগে মাস পাঁচেক ছিল এই বাঙলোয়। তারপর কোথায় চলে গেছে কেউ খবর রাখে না। খোসলার সম্বন্ধে কোন বিস্তারিত বিবরণই সে দিতে পারে না। শুধু এইটুকু জানে যে খোসলা রিক্রুটিংএ কাজ করত।

খাওয়া শেষ করে ছোটেলালকে ডেকে রাত্রে ওর খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করতে বলল বিকাশ।

'কেন সাহেব, উনি কি থাকবেন এখানে ?'

'তাইত বলছেন। থাকলই বা, আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি, ও পেত্নী নয়, খাঁটি মানুষ, বুঝলে ছোটেলাল।' ছোটেলাল তা বুঝতে পেরেছে অনেক আগেই কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেমসাহেব কি করে সাহেবকে জমিয়ে ফেলল, সেটা বুঝতে তার দস্তুর মত বেগ পেতে হচ্ছিল।

'লেকিন সাব—

'লেকিন ওকিন কুছ নেহি ছোটেলাল। বাড়ীতে কেউ আশ্রয় চাইলে তাড়ানো পাপ। ওই মেয়েটি এসেছে এখানে

ক্যাপ্টেন খোসলার খোঁজে। এখানে ওর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। কাজেই এক দু'দিন আমাদের বাসায় থাকলে ক্ষতি কি। জায়গার তো অভাব নেই—তিনটে ঘর ফাঁকা পড়ে রয়েছে। তাছাড়া ভদ্রলোকের মেয়ে। হোটেলে টোটেলে থাকলে কার কুনজরে পড়ে যায়। দরকার কি ?'

ছোটলাল স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হল।

'আরে শোন, বিকেলে একটু ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কোরো।'

'জি সরকার।'

ঘরের মধ্যে বিছানার উপর চুপ করে বসে আঙ্গুল দিয়ে বিছানায় দাগ কাটছে মেয়েটি। দরজাব পাশ থেকে কিছুক্ষণ সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল বিকাশ। মেয়েটির মুখে কেমন একটা কোমল বিষাদের ছাপ আছে। মনকে সহানুভূতিতে আর্দ্র করে তোলে। দুই মাস উধাও হওয়া কোন এক ক্যাপ্টেন ব্রিজনারায়ণ খোসলার প্রেমিকা। কে জানে সত্যিই খোসলা বেচারী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মারা গেছে কি না। তাই যদি হয়, তা হলে ক্ষোভের অন্ত থাকবে না। তা ছাড়া সেই মর্মান্তিক সংবাদের পর এ মেয়েকে প্রবোধ দেওয়া শক্ত। বিকাশের বুক শিরশির করে করুণায়।

বাইরে গাড়ীর হর্ণ শুনে বিকাশ একটু কেসে বিদায় নিল।

'আচ্ছা আমি চলি এবার। যখন যা দরকার হবে, ছোটেলালকে বলবেন, তা ছাড়া ওর বউ লছমনিয়াও আছে।'

'কখন আবার আসবেন ?'—মেয়েটি উঠে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

'সন্ধ্যার মধ্যেই। খুব একলা মনে হলে রেডিও খুলে দিতে পারেন। কলকাতা ষ্টেসন ধরা আছে, বাঙলা গান শুনতে পাবেন।'

'আপনি বাঙালী বুঝি ?'

'আপনার কি মনে হচ্ছিল এতক্ষণ ?'—বিকাশ হাসল।

'ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলাম না। আগে কখনও কোন বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়নি।'

'এবং এবার বেশ ভাল করেই হল। আমারও এই প্রথম পরিচয় হল একজন মারাঠী মেয়ের সঙ্গে। আচ্ছা, সন্ধ্যায় আলাপ করা যাবে। এখন চললাম।'

বাইরে বেরিয়ে প্রাঙ্গনের গেটে এসে ফিরে তাকালো। মেয়েটি দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে তার পথের দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখাচোখী হয়ে যেতেই কেমন একটা লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ষ্টাফ কারে উঠে দরজা বন্ধ করে দিল বিকাশ।

'হু ইজ দ্যাট্ লেডি ? ইওর ওয়াইফ ?'

বিকাশ চমকে সামনে তাকিয়ে দেখল ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন, পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাষ্টার মেজর আজিজ আমেদ।

বিকাশ বলল, 'আপনি বসে আছেন, দেখতেই পাইনি।'

'কি করে আর পাবেন, চোখ দুটো তো মনের অধীন। মনটা কোথায় ছিল তা তো বুঝতেই পারছি। বউ বুঝি ?' ঠাট্টার স্বরে বললেন মেজর আজিজ আমেদ।

'আমার বউ নয় তবে মেডিক্যাল কোরের আর একজন অফিসারের ফিঁয়াসে।'

'আই সি! তা একজনের ফিঁয়াসে আর একজনের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে কেন ?'

'সময়ের ফেরে বাঘও বাবলা গাছে চড়তে বাধ্য হয়, হরিণও সিংহের গাল চাটে।' বিকাশ হাসল।

'অর্থাৎ···

এবার হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে পড়ল বিকাশ। কথাটাকে এভাবে বলা ঠিক হয়নি। এখনি নানা রকমের সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। তাতে তার সুনামের হানি হবার সম্ভাবনা আছে। তার চেয়েও ব্যাপারটাকে সহজ করে ফেলাই ভাল। বলল, 'অর্থাৎ উনি এখন আমার অতিথি, কাজেই আমার পথের দিকে তাকিয়ে থেকে ভদ্রতা রক্ষা করছেন। বিশুদ্ধ ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আত্মীয়তাও আছে আমার সঙ্গে।'

'আই সি! ঠাট্টা করেছি বলে ক্ষমা চাইছি।'

'কোন প্রয়োজন নেই। ঠাট্টাটা আমিও উপভোগ করেছি।'

গল্প করতে করতে হাসপাতালে পৌঁছে গেল গাড়ী।

'আচ্ছা গুডবাই।'

'বাই বাই।'

বিকাশকে নামিয়ে দিয়ে মেজর সাহবকে নিয়ে চলে গেল গাড়ী।

বিকাশের গাড়ী দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই অনুসূয়া কাঁচের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্যমনস্কভাবে।

গত রাত্রে যে কাপড় পরে সে দরজার বাইরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সেই সাড়ী হাতে করে ঘরে এসে ঢুকল লছমনিয়া।

'মেমসাহেব আপনার সাড়ী।'

অনুসূয়া ফিরে তাকিয়ে বল্‌ল, 'তুম্ লে লেও।'

'আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন মেম্‌সাহেব ?'

'পারি একটু একটু।'

'সাড়ীটা আমায় দিয়ে দিচ্ছেন ? কেন ?'

'বকশিস্,' অনুসূয়া হাসল, 'ও সাড়ী পরলে তোমাকে বেশ মানাবে, পরে' এসো না দেখি একটু।'

কাপড়খানার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল লছমনিয়া। দামী রঙিন সাড়ী। যে পরবে তাকেই মানাবে। রঙিন সাড়ী তারও আছে দুই একখানা, তবে এত ভাল একটাও নেই। মুখে তার একটা খুসীর আমেজ লাগল।

'না মেমসাহেব, নতুন কাপড়—'

"নতুন বলেই তো তোমায় দিলাম। ওহো, দাঁড়াও, ওর সঙ্গে মিলিয়ে একটা নতুন ব্লাউসও তো দিতে হবে।'—ঘরের কোনায় রাখা স্যুটকেসটা খুলে একগাদা ব্লাউস বার করল অনুসূয়া।

'কোনটা চাই তোমার? আচ্ছা নাও এই কালোটা।'

ব্লাউসটা হাতে নিয়ে গদগদ কণ্ঠে লছমনিয়া বল্‌ল, 'সত্যি দিয়ে দিলেন?'—বিশ্বাস করতে তার যেন কষ্ট হয়।

'তবে কি মিথ্যে। কাল এত কষ্ট করে আমার প্রাণ বাঁচালে, তোমরা না থাকলে আমি কি আর আজ তোমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বেঁচে থাকতাম। তুমি আমার বহিন, বড়ী বহিন।'

'আচ্ছা বহিন, তোমাদের সাহেব ফিরে আসবেন কখন?'

'সন্ধ্যায়, কখনও কখনও রাতও হয়ে যায়।'

'সাহেব খুব ভাল লোক বুঝি?'—অনুসূয়া গৃহকর্তার ভাবগতিক আন্দাজ করে নিয়েছে কিছুটা। আরও বিষদ ভাবে জেনে নিতে চায়।

'ভাল লোক কি, একেবারে দেওতা, সাহেবের 'দিল' খুব দরাজ, মদ ভাঙ নেশা নেই, শুধু সখ গান বাজনায়, ব্যাস।'

'তাই নাকি, গান বাজনায় খুব সখ বুঝি?'

'বহুত, ছোটেলাল ওঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করে বলে সাহেব ওকে আরও দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার জুতো ছিল না, ছোটেলালকে টাকা দিয়ে আমার জুতো কিনিয়ে দিয়েছেন। ছোটেলাল বলে, এত বছর ধরে এই বাঙলোয় কাজ করছে, এরকম ভাল লোক নাকি সে জীবনে দেখে নি। এই দেখুন না, আগে এখানে খানসামাদের বউ নিয়ে থাকবার হুকুম ছিল না, সাহেব সেই হুকুম তুলে নিয়ে আমাকে ছোটেলালের সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন।'

'তাই নাকি? সাহেব তো তাহলে সত্যিই খুব ভাল লোক। ছোটেলালের সঙ্গে থাকতে পেয়ে তুমি খুব খুসী হয়েছ?' অনুসূয়া মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে প্রশ্ন করে।

সলজ্জ হেসে লছমনিয়া মাথা নেড়ে জানাল, সে সুখী হয়েছে।

এ বাড়ীর কর্তা যে ভাল লোক এবং কোন নেশা ভাঙ বদখেয়ালের পূজারী নয়, সে খবরে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল অনুসূয়া। অবশ্য গোড়া থেকেই সাহেবের আচার ব্যবহারে তার মনে হয়েছিল লোকটা খারাপ নয়। এখন বুঝলো লোকটি ভালোই, বাঙলা আর বাঙলী সম্পর্কে বরাবরই তার একটা বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা মিশ্রিত বিচিত্র ধারণা ছিল। সে দেশের ছেলেমেয়ে বোমা বন্দুক আর গুপ্ত-সমিতি ক'রে ইংরেজ তাড়াবার ফন্দী আটে, মেয়েরা 'বুলবুলের'

মত গান গায়, আবার কবিতা লেখে নাকি সবাই। বাঙালীদের সম্বন্ধে তার আগ্রহ বরাবরের অথচ আশ্চর্য, এই প্রথম সে একজন বাঙালীর সঙ্গে পরিচিত হল।

অনুসূয়া দেখল ঘরের দেওয়ালে গীটার ঝুলছে, ঠিক তার নীচেই একজোড়া'তব্‌লা, ওপাশে চুল্লীর ওপর রেডিও সেট।

'সাহেব বুঝি গীটার বাজান?'

'হ্যাঁ, সাহেবের ভারী সখ পিয়ানো শিখবেন, তাই একটা পিয়ানো ভাড়া করেছেন কিন্তু শেখাবার লোক পাচ্ছেন না।'

অনুসূয়া দেখল ঘরের কোনায় সত্যিই একটা পুরোনো পিয়ানো বসানো রয়েছে। পায়ে পায়ে পিয়ানোর সামনে গিয়ে সে মৃদু আঘাত করে হাল্কা সুর তুলল।

'আপনি জানেন নাকি মেমসাহেব?'

'একটু একটু'

ছোটেলাল খাট বিছানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। লছমনিয়া এগিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে।

ঘরের মধ্যে খাট বিছানা রেখে প্রশ্ন উঠল—কোন্‌ ঘরে সেটাকে লাগানো হবে। ছোটেলাল বোঝে সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেব একঘরে নিশ্চয়ই শোবে না, কারণ এখানে মেম সাহেব অপ্রত্যাশিত অতিথি। আগে কেউ কাউকে চিনত না। রাত্রির অন্ধকারে তারা এক ঘরে কেন, এক

বিছানাতেও শুতে পারে কিন্তু দিনের বেলায় ব্যবধানটা থাকবে খুব স্পষ্ট। তবুও সাহেব মেমদের ব্যাপার, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা না জেনে কোন কাজ করার বিপদ আছে অনেক। দীর্ঘ দিনের চাকরীর অভিজ্ঞতা তাকে দিয়েছে এই শিক্ষা।

'কাঁহা লাগাউঁ চারপাই?'—অস্ফুটে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল ছোটেলাল।

'কেন পাশের ঘরে।'—সহজ সুরে জবাব দিল লছমনিয়া। তার সরল বুদ্ধিতে এটা কোন সমস্যার আকারে দেখা দেয় না।

'কি মেমসাহেব তাই করব?'—অনুসূয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল ছোটেলাল।

অনুসূয়া এতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দেখছিল। হঠাৎ ছোটেলালের প্রশ্নে সে যেন নিজেকে ফিরে পেল।

'হ্যাঁ, তাই কর। ঘর যখন রয়েছে বেশী তখন সেগুলো সবই কাজে লাগুক।' অনুসূয়া সহজ হবার চেষ্টা করল। তারা দুজনে যে একঘরে কিছুতেই শুতে পারে না এবং শুলে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আর ওদের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না, তা সে জানে খুব ভাল করেই। কিন্তু সেই যুক্তিটা ওদের সামনে তুলে ধরে আলাদা আলাদা ঘরে থাকবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা ওর উচিত বলে মনে হল না। ওরা কেউ জানে না কোথা থেকে সে এসেছে,

কেন এসেছে এবং সাহেবই বা তার কে হয়। সাহেবের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে সহজ—এই ধারণা ওদের মনে না ঢোকানো গেলে নানা রকম অশোভন সন্দেহই দানা বেঁধে উঠবে। তাতে কারও লাভ নেই বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

ছোটেলাল ততক্ষণে খাট বিছানা পাশের ঘরে পেতে ফেলেছে। লছমনিয়াকে বল্‌ল, 'রান্নাঘরে মাংস এনে রেখেছি, পরিষ্কার করে মসলাটা মাখিয়ে রেখে দে আর মেমসাহেব চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা কর।

'চা পেলে ভারী খুশী হই। বড্ড শীত তোমাদের এখানে।'

'বহুত আচ্ছা মেমসাব, আভি ল্যাতা।'

ছোটেলাল বেরিয়ে গেল। লছমনিয়াও গেল পিছু পিছু। একলা ঘরে হঠাৎ তার মনটা কেমন করে উঠল। এই যে গায়ে পড়ে অপরিচিত একজনের বাড়ীতে এসে ওঠা, অজ্ঞাত কুলশীল একটি যুবকের সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করা —এসব অশোভন, সুরুচির পরিচায়ক নয়। জীবনে কোন দিন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা তো কদিন আগেও কল্পনা করতে পারত না সে। তবুও কি বিপর্যয়ই না প্রকট হয়ে উঠেছে তার সামনে। যত হীনতা দীনতা সবই আজ তাকে সইতে হবে মুখ বুজে কারণ খোসলাকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটেছে তার জীবনে, তার জন্য একমাত্র সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। প্রথম প্রেমের দুর্দমনীয় আবেগে

খোসলাকে সে তার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ অর্পণ করেছিল অসঙ্কোচে, দ্বিধাহীনচিত্তে। কোন পুরুষের কাছে নিঃশেষে নিজেকে দান করার আগে পর্যন্ত নারীর যে মান সম্ভ্রম এবং মর্যাদা থাকে, গ্রহিতা যদি সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তাহলে সে মেয়ের বিপদের অন্ত নেই। নিজেকে দিয়েই তো তা সে টের পাচ্ছে মর্মে মর্মে। খোসলার সঙ্গে তার হৃদ্যতা অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিল। সে সব সন্দেহকে আমল দেয় নি অনুসূয়া। মানুষ সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল্ হয়েই থাকে। কিন্তু রক্ষণশীলতার জের টেনে প্রেম ভালবাসার মত মহৎ বৃত্তিকে জোর করে দাবিয়ে রাখা তার উচিত মনে হয় নি। 'অচেনা অজানা বিদেশী' বলে যারা তাকে সতর্ক করতে এসেছিল, তাদের সে সদম্ভে উপেক্ষা করেছে। ভালবাসা কি চেনা অচেনা দেশ বিদেশের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয় না ; সে তো নিজের চোখে দেখেছে ইংলণ্ডের কত মেয়ে এ দেশী ছেলেকে বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। ভালবাসা হ'লো কালজয়ী, দেশজয়ী, সর্বজয়ী।

তবু মাঝে মাঝে নিজের মনেই সন্দেহের বাষ্প জমে ওঠে। ভালবাসা যতই মহান হোক, ভালবাসার ছলনা…… না না ছলনা নয়। খোসলা তার সঙ্গে ছলনা করে নি। হয়ত কোথায় কোন ফ্রণ্টে দিনরাত অবিরাম পরিশ্রম করছে, সময়ই পায় না চিঠি লেখার। রাত্রে শোবার সময়

কিংবা নির্জন সন্ধ্যায় সে নিশ্চয়ই ভাবে তার 'লিট্‌ল্ পরাঞ্জপের' কথা। সেকেন্দ্রাবাদের সেই সব আনন্দ উচ্ছল দিনগুলোর স্মৃতি, অজন্তা গুহা দেখতে গিয়ে চার দিন এক হোটেলে কাটানোর সংবেদনা—উঃ! সে সব মনে পড়লে আবেগে তার নিজের বুকেই কাঁপুনি ধরে যায়। অবিস্মরণীয় সে সব কথা ভুলবে কি করে খোসলা? হয়ত সেও এমনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চোখে তার জল জমে ওঠে। আহা বেচারী! আর বেশী ভাবতে তার ভয় করে। রণক্ষেত্রের জীবন—সেখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না, হত্যা করে; দয়া মায়া, হৃদয়ের দেওয়া নেওয়া, মনের আদান প্রদান নেই, আছে হত্যার কৃতিত্ব, পাশবিকতার বাহবা। যদি কোন অঘটন ঘটে থাকে! তাহলে এজন্মের মত যা হবার হয়ে গেছে। নিজের অজ্ঞাতে কান্নায় বুক ভেসে যায় অনুসূয়ার।

ছোটেলাল কখন চা নিয়ে এসেছে দেখতেই পায় নি সে। হঠাৎ তার আহ্বানে সচকিত হয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেল্‌ল। ছোটেলাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুসূয়া অপ্রতিভ হয়ে পড়ল মুহূর্তের জন্য। নিজেকে ধরা দিয়ে ফেলেছে ওদের সামনে। তাড়াতাড়ি মুখে হাসি ফুটিয়ে বল্‌ল, 'দাও, এত তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলেছো। তুমি খুব কাজের লোক। লছমনিয়াও খুব ভাল, ও আমার বড়ী বহিন, বুঝলে?'

ছোটেলাল বুঝল কিনা বোঝা গেল না কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে কামরায় প্রবেশ করল বিকাশ।

অনুসূয়া উঠে দাঁড়াল। ছোটেলাল এগিয়ে গেল তার ওভারকোটটা হাত থেকে নিতে।

প্রথমেই সুইচ টিপে আলো জ্বাল্‌লো বিকাশ। ঘরে যে কখন বৈকালিক আঁধার ঘনিয়ে উঠেছিল টের পায়নি কেউ। আশ্চর্য লাগে অনুসূয়ার। কড়া আলোর নীচে হঠাৎ সে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

'চায়ে লাও ছোটেলাল, আজভি বহুত জাড়া।'

'ল্যাতা হুজুর।'

ছোটেলাল দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায়।

'সারা দুপুর আপনার ব্রিজনারায়ণ ক্যাপ্টেনের খোঁজ করলাম'—চেয়ার টেনে অনুসূয়ার মুখোমুখি বসে আলাপ সুরু করে বিকাশ। 'প্রথমে হাসপাতালে খোঁজ নিলাম। কেউ বলতে পারে না। স্টোরের হেড্‌ক্লার্কের কাছে শুনলাম রিক্রুটিং-এ খোসলা নামে একজন ক্যাপ্টেন নাকি কাজ করে গেছেন বছর দুয়েক আগে। ছুটি নিয়ে রিক্রুটিং অফিসেও গেলাম। সেখানকার কেরানী বলল, খোসলা এখান থেকে ঝাঁসীতে বদলী হয়ে গিয়েছিল, তারপরের খবর কিছু জানে না, আগের খবরও নয়। তবে সে এখানে এসেছিলো নর্থওয়েষ্টার্ণ কমাণ্ডের, হেড কোয়ার্টার রাওয়ালপিণ্ডি থেকে। বাড়ী নাকি তার মুলতান জেলায়। সব শুনে মনে হ'লো উনি আপনার খোসলা হ'তে পারেন।'

অনুসূয়া জবাব দিল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। হতেও পারে, খোসলার দেশ হয়ত মুলতানেই। সঠিক জানে না সে। খোসলা পাঞ্জাবের লোক এইটুকুই তার জানা আছে, তার বেশী জেনে নেবার কথা তার কখনও মনে হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি খোসলার অতীত জীবনের কথা কিছুই সে জানে না। খাঁকির পোষাক পরা দাড়ি গোঁফ মসৃন করে কামানো লম্বা চওড়া খোসলাকে যতটুকু সে দেখেছে সেকেন্দ্রাবাদে, সেইটুকুই তার জীবনকে এত বেশী অভিভূত করে ফেলেছিল যে তার বাইরে কিছু জানবার আগ্রহ কখনও দেখা দেয়নি।

'যতদূর জানলাম খোসলার খোঁজ করতে হ'লে লক্ষ্মৌ যেতে হবে, কারণ মেডিকাল কোরের রেকর্ড অফিস হচ্ছে সেখানে। সেখানেই পাওয়া যাবে তার হদিস। দিল্লীর জেনারেল হেড কোয়ার্টারেও অবশ্য খোঁজ করা যেতে পারে। প্রথম ঠিক করুন আপনি কি করবেন। আমার মনে হয় লক্ষ্মৌ চলে যাওয়াই ভাল।'

এবারও মাথা নীচু করে মুক হয়ে রইল অনুসূয়া। কাপড়ের আচলে আস্তে আস্তে আঙুল ঘষতে লাগল। জবাব দেবার যেন কিছু নেই তার।

'আপনাকে নিয়ে তো দেখছি সমস্যা। যাই হোক, ভেবে দেখুন ভাল করে'—চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল বিকাশ। ছোটেলাল চা নিয়ে এল।

'মেমসাহেবকে চা দিয়েছ?'

অনুসূয়া মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ আমি খেয়েছি।'

তার গলার স্বরে কান্নার আবেগ। চোখে মুখে বেদনার বলি রেখা। সেদিকে তাকিয়ে বিকাশের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। তার কথার মধ্যে কোথায় যেন রূঢ়তা বেজে উঠেছে, নিজের কানেও।

এ মেয়ের মুখের সরলতায় কেমন একটা নরম দ্যুতি আছে। আঘাত পেলে করুণ কোমলতায় স্পর্শ কাতর হয়ে ওঠে। ওর উপর নির্মম হতে, কঠিন হতে পারবে না বিকাশ। যত বিপদ আপদের আশঙ্কাই থাকুক না কেন। ওকে খুশী করবার জন্য হঠাৎ সে সহজ হবার চেষ্টা করল।

'খেয়েচেন চা? শুনে খুশী হলাম। আপনার যে অপরিচয়ের মিথ্যা সঙ্কোচ নেই—এটা আমার কাছে কত যে ভাল লেগেছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা তো রয়েছিই। খোসলাকে খুঁজে আনবই।'—হাসিমুখে তাকিয়ে রইল বিকাশ ওর হেট মুখের দিকে। আস্তে আস্তে মুখ তুলল অনুসূয়া। তার সরল দুটি চোখ মিলল বিকাশের ঔৎসুক্যে অধীর দুটি চোখের ওপর।

'কাল রাত্রে কেন আপনি আমাকে বাঁচালেন, কেন মরতে দিলেন না, কেন......কেন!' কান্নার উচ্ছ্বাস দমন করবার জন্যে সে বালিসে চেপে ধরল নিজের মুখটা। বিকাশ বোকার

মত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল।

ভরা চায়ের কাপ চুল্লীর ওপর পড়ে রয়েছে। সাহেব যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, তাতে তাঁর চায়ের কথা মনে আছে বলে বোধ হলো না ছোটেলালের। সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিল, 'আপনার চা ঠাণ্ডা হচ্ছে সাহেব।'

'ও, এদিকে দাও।'

ছোটেলাল পেয়ালা হাতে এগিয়ে গেল। বিকাশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। এই মুহূর্তে নাটকীয় ঘটনা একটা ঘটে গেল ছোটেলালের সামনেই। কে জানে কি বুঝেছে ও। তবু ভাগ্যের কথা, কথোপকথনের ভাষাটা ওর বোধগম্য নয়।

'আচ্ছা, আভি যাও তুম্।'

চায়ের পেয়ালা হাতে আবার সে এসে দাঁড়াল অনুসূয়ার সামনে। বালিসে মুখ গুঁজে তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে সে। সারা দেহ কাঁপছে থর থর করে। পিঠের ওপর থেকে আঁচল খসে গেছে। শুভ্র ঘাড়ের উপর এলোমেলো চুলের রাশি। আটো সাটো ব্লাউজে জড়ানো নিটোল পিঠের ওপর হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার লোভ হয়। কিন্তু কিসের সান্ত্বনা? সান্ত্বনা দেবার সে কে?

একটু কেসে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বিকাশ বলল, 'দেখুন, আমি জানি আপনি খুবই সঙ্কটে পড়েছেন, কিন্তু

এভাবে কান্নাকাটি করে লাভ তো কিছু নেই। তার চেয়ে আসুন না, আমরা দুজনে আলোচনা করে ঠিক করি, কি করা যেতে পারে।'

অনুসূয়া উঠে বসল আবার। আর সে কাঁদছে না। আঁচল দিয়ে চোখ থেকে জলের দাগ মুছে ফেলেছে।

'সত্যি কথা কি জানেন, আপনাকে নিয়ে আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছি। আপনি হয়ত বাড়ীর সঙ্গে আড়ি করে না বলে চলে এসেছেন। বাড়ীর লোকেরা নিশ্চয়ই পুলিসে খোঁজ খবর করছে। এর পর আবার না লাল পাগড়ীব হাঙ্গামায় পড়তে হয়।'

'সে ভয় করবেন না ক্যাপ্টেন.........'

'মজুমদার, বিকাশ মজুমদার। কিন্তু ভয় নেই কেন ?'

'ভয় নেই, কারণ আমার খোঁজ কেউ করবে না।'

বিকাশ ঠাট্টা করে বলল, 'কেন আপনি কি গৃহ থেকে বিতাড়িতা ত্যাজ্যপুত্রী ?'

'তা ঠিক নয়, কিন্তু আমার সঙ্গে আমার আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কের সূত্র অত্যন্ত শিথিল। আমার বাবা শোলাপুরে অধ্যাপনা করেন আর আমি সেকেন্দ্রাবাদে শিক্ষকতা করি। মা মারা গেছেন ছেলেবেলায়। বাবা থাকেন সৎমা এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আমার সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহও নেই, উৎসাহও নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমি তাঁদের কাছছাড়া। বোম্বাইতে পিসিমাদের বাসায় থেকে

লেখাপড়া শিখেছি, বি-টি পাশ করে সোজা চলে গেছি সেকেন্দ্রাবাদে। বাবার সঙ্গে বছরে একবারের বেশী দেখাই হয় না। তাছাড়া এখানে আসার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। পাঞ্জাবী বলে খোসলার নাম শুনেই তিনি চটে ওঠেন। যে কারণেই হোক উত্তর ভারতের লোকদের সম্বন্ধে তাঁর একটা বদ্ধমূল খারাপ ধারণা আছে। আমার সৎমাও খুব গোঁড়া পরিবারের কলহপ্রিয় মহিলা। তিনি আমাকে তাঁর ভাই-পোর জন্য মনোনীত করে রেখেছিলেন। রাজি হতে পারিনি বলে ক্ষুণ্ণ হন। তারপর আমি সেকেন্দ্রাবাদে ফিরে যাবার নাম করে চলে এসেছি এখানে। কাজেই তাঁদের টের পেতে পেতে আরও মাস দুয়েক।'

'বুঝলাম,' বিকাশ হাসল, 'আপনার বাড়ীর লোকেরা বুঝি এ বিবাহের ঘোর বিরোধী?'

'—কিন্তু আমার আশু সমস্যা বিবাহের নয়—তার চেয়ে অনেক অনেক বড়—'

কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা নীচু করে নীরব হ'য়ে রইল অনুসূয়া। বিকাশ অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল তার দিকে, সমস্যা যা কিছু আছে পৃথিবীতে তা সবই তো বিবাহের চেয়ে বড়। তবু কি না জানি একটা কিছু সাংঘাতিক কথা বলে বসবে সামনে বসা এই অপরিচিতা।

'আমি—আমি—অন্তঃসত্ত্বা—'

দুই হাতে মুখ ঢাকলো অনুসূয়া।

বিকাশের মাথার স্নায়ুকেন্দ্রে যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগল। ভাবনা চিন্তা যা কিছু সব গেল তালগোল পাকিয়ে। কাল রাত্রে ওর ওপর ডাক্তারী করবার সময় এমন একটা সন্দেহের আভাস তার মন স্পর্শ করেছিল কিন্তু দাগ কাটতে পারেনি।

খোসলা শুধু প্রেমই করেনি ওর সঙ্গে। প্রেমের পথ ধরে দেহের সীমানা পেরিয়ে যে জটিল পরিস্থিতির সামনে এনে ওকে দাঁড় করিয়েছে সেখানে পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্করই বটে।

'আপনাদের বিবাহ............'

তাকে শেষ করতে দেবার আগেই অনুসূয়া বলল, 'আমাদের বিবাহের অবকাশ মেলেনি। যখন বিবাহের কথাবার্তা চলছিল, সেই সময়ই খোসলা বদলী হয়ে যায়।'

'তারপর আর খোসলার সঙ্গে কোন পত্রালাপও হয়নি ?'

'না। আমি জানিই না সে কোথায় আছে। আমায় বলেছিল সে নাকি ফিল্ড সার্ভিসের জন্য মনোনীত হয়েছে, তাই কোথায় থাকবে তার ঠিক নেই।'

'খোসলা জানত আপনার কথা.......আপনি......'

'না। তাও জানত না। সে চলে যাবার কয়েকদিন বাদে আমি বুঝতে পারি।'

লজ্জায় তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিকাশ আবার প্রশ্ন করল, 'খোসলাকে আপনি নিশ্চয় ভাল করে চেনবার অবকাশ পেয়েছেন। সে যে আপনার বিশ্বাসের অমর্যাদা করে নি, সে সম্বন্ধে আপনি সুনিশ্চিত কি?'

এ বড় কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্ন গত কয়েক সপ্তাহ অনেকবার অবরোধ করেছে তার মনকে, কিন্তু বেশীদূর ভাবতে তার আতঙ্ক লাগে। মানুষ চেনার সাধারণ যে সব সূত্র আছে, তা দিয়ে সব মানুষকে চেনা যায় না। নিজের অভিজ্ঞতায় এ কথাটা সে বুঝুক আব নাই বুঝুক, নাটক নভেলে অন্তত পড়েছে।

খোসলার সঙ্গে তার পরিচয় গার্ল গাইডদের এক ফার্ষ্ট এইড্ প্যারেডে। স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে খোসলা মেয়েদের ফার্ষ্ট এইড্ শেখাতে এসেছিল হাতে কলমে। স্বাস্থ্যবান সুন্দর সুপুরুষ। প্রথম দেখার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল সরস আলাপে। তার বলিষ্ঠ তেজস্বী গড়ন, স্মার্ট ব্যবহার, ফিটফাট সামরিক পোষাক, কাঁধের ওপর জ্বলজ্বলে তিনটি পিতলের তারা—এ সবই তাকে অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণ করেছিল। খোসলাও এগিয়ে এসেছিল আগ্রহভরে, যদিও সুস্পষ্ট আভাস অথবা ইঙ্গিতে কোনদিনই সে খোসলাকে আহ্বান করেনি।

সে ভেবেছে প্রাণের টান। জন্ম-জন্মান্তর এক সূত্রে গাঁথা তুটি আত্মার মিলন-বিচ্ছেদের শাশ্বত লীলার প্রতিফলন বাস্তব জীবনে। পুরুষ আর প্রকৃতি। প্রকৃতির আদি প্রাণের সহজ প্রবর্তনা তার স্বভাবের মধ্যে। জীবলোকে প্রাণকে বহন করা, প্রাণকে পোষণ করার মহান দায়িত্ব নিয়ে জন্ম তার। প্রাণ সাধনার আদিম বেদনা তার রক্তে, তার হৃদয়ে। নিজেকে এবং অন্যকে ধরে রাখবার জন্য প্রেম স্নেহ সকরুণ ধৈর্য্যের বন্ধনজাল তাকে গাঁথতে হবে। মেয়ে হয়ে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল দায়িত্ব এসে পড়েছে তার জীবনে। সে হল প্রকৃতির প্রতিনিধি। দেহের এবং মনের সৌন্দর্য এবং সৌষ্টবের মোহজাল বিস্তার করে আগে সে বাঁধবে পুরুষকে। তারপর ধারাবাহিক জীবসৃষ্টির সাধনায় আত্মনিয়োগ। তার রূপলাবণ্য হচ্ছে সৌরভ, তার অন্তর হল মধু, মধুকর আসবে গন্ধের নেশায়, মধুর লোভে। তারপর একদিন গন্ধ যাবে হাওয়ায় মিশে, ঝরে পড়বে শুক্‌নো ফুল ধুলোয়, মিলনের স্মৃতিকে অক্ষয় করে ধরবে ফলের ভ্রুণ। এই তো নারী-জীবনের শাশ্বত সার্থকতা।

সে নিজে যেমন নিছক একটি নারী নয়, সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিভূ, তেমনি খোসলাও নিছক একটি পুরুষ নয়, অনাদি অনন্ত পুরুষের প্রতিভূ। হাস্যে লাস্যে আত্মদানে এই পুরুষের সঙ্গে দ্বৈতলীলায় মগ্ন হওয়ার মধ্যে সে পেয়েছে কেমন একটা অলৌকিক আত্মিক প্রশান্তি। আদিম সৃষ্টির

আবেগ স্পন্দন অনুভব করেছে নিজের বুকের মধ্যে—দেহের মধ্যে।

খোসলাকে সে চিনে নেয়নি, কারণ খোসলাকে কোন দিনই তো তার অচেনা মনে হয়নি। যে খোসলা নিবীড় আলিঙ্গনে তার সংবেদনশীল হৃদয়ে গভীর উত্তাপ সঞ্চার করছে, গাঢ় চুম্বনে যৌবনের কামনাকে প্রস্ফুটিত করেছে, কঠিন পরশে শিরায় শিরায় আলোড়ন তুলে দেহকে বেঁধেছে মনের একান্ত গোপন কামনার সুরে—সে খোসলার দেশই বা কোথায় আর বাবাই বা কে, তা জানবার তাগিদ সে কখনও অনুভব করেনি।

ওকে নীরব দেখে বিকাশ বলল, 'প্রশ্নটা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ত, তবুও খারাপ দিকটার সম্বন্ধেও সচেতন থাকা উচিত। থিয়েটারে একটি মেয়ে যখন সতী-সাধ্বীর ভূমিকায় অভিনয় করে, তখন অভিনয়ের গুণে সেইটাই সত্য হয়ে ওঠে দর্শকের কাছে, কিন্তু সে তার আসল পরিচয় হয় না সব সময়। সে মেয়ে হয়ত কোন কুখ্যাত পল্লীর রূপোবজীবিনী। দেশে তো সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হয়নি, কাজেই প্রতারণা প্রবঞ্চনা তো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। খোসলা হয়ত এসব নন। তিনি হয়ত মহৎ চরিত্রের উন্নতমনা মানুষ, তবুও যা অসম্ভব নয় তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ভেবে নেওয়া উচিত। ধরুন একটা নিতান্ত কাল্পনিক পরিস্থিতির কথা: খোসলা যদি প্রতারণা করে থাকে আপনার সঙ্গে?'

দুই হাতে মুখ-চোখ ঢেকে একটু কান্না-মেশানো উঁচু কণ্ঠে অনুসূয়া চেঁচিয়ে উঠল : 'না···না···না···ভাবতে পারি না আমি···পারি না···তাহলে আত্মহত্যাই আমার পথ··· মৃত্যু···!'

অস্থির ভাবে মাথা ঝাঁকাতে লাগল অনুসূয়া।

'আশা করি তা হবে না। তাহলে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে খোসলার ঠিকানা খুঁজে বার করা। এ কাজের জন্য লক্ষ্ণৌতে অবশ্যই যেতে হবে।'

কথা শেষ হবার আগেই অনুসূয়া বলল, 'যেতে আমার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু আমি তো উত্তর ভারতে এর আগে কখনও আসিনি, কিছুই চিনি না, কিছুই জানি না। কোথায় গিয়ে থাকব, কি করে খোঁজ করব তাও একটুও বুঝতে পারছি না। তা'ছাড়া কোনক্রমে যদি আমার নিরুদ্দেশের খবর রাষ্ট্র হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পুলিসের নজরে পড়ে যাব সহজেই, এভাবে একলা একলা পথে-ঘাটে চলাফেরা করলে। সারা জীবনের মত আমাকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না।

'অর্থাৎ আপনি খোঁজার কাজটা আমার উপরই চাপাতে চান।'—বিকাশ হাসল।—'তা না হয় নিলাম কিন্তু তাতে যে দেরী হবে। ছুটি পেতে পেতেই যাবে প্রায় মাস-খানেক। ততদিন আপনি যদি এখানে আমার বাসায় থাকেন তাহলে সেটাও তো ভাল দেখাবে না। কি জানি,

খোসলার কাছেও দৃষ্টিকটু ঠেকতে পারে। মেয়েদের চরিত্রের সুনাম খুব ঠুন্‌কো জিনিষ তো। অবশ্য একথা ঠিকই, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক্যাণ্টনমেণ্টের জীবনে সামাজিক অনুশাসন জবরদস্তির মত চেপে বসেনা কারণ, এখানে কেউ কারও খবর রাখে না, তবুও এত বড় ঝুঁকি নিয়ে আপনার পক্ষে এখানে থাকা উচিত কি না, তাও আপনাকে ভাল করে ভেবে দেখতে হবে।'

অনেকক্ষণ মৌন থেকে অনুসূয়া বলল, 'কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে আম্বালায় যাত্রা করে-ছিলাম, তিনি আমাকে আপনার আশ্রয়ে তুলে দিয়েছেন। যখন অন্য কোন পথ পাচ্ছি না, তখন চরম ঝুঁকি নিতে হবে বই কি। তাছাড়া মিথ্যাকে আমার ভয় করা উচিত নয়। মিথ্যে দুর্ণাম রটলে ঘৃণার সঙ্গে তাকে উপেক্ষা করার মত সৎসাহস আমার আছে।'

'তাহলে বেশ। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে দেখবেন শেষকালে আমাকে কোন দায়ে ফেলবেন না।'

'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ক্যাপ্টেন। আমার জীবনে আপনি ঈশ্বর-প্রেরিত। আমার এই তেইশ বছরের জীবনে যদি কোন মহত্ব অর্জন করে থাকি তবে তা আপনার কল্যাণেই উৎসর্গ করেছি মনে মনে।'

'ঈশ্বর নামক একটি সর্বব্যাপী অজ্ঞাত সত্তার উপর দেখছি আপনার প্রচুর আস্থা। সেই জন্যই সম্ভবত এত ঝঞ্ঝাটে

পড়েছেন। নিজের উপর আস্থা রাখলে বোধহয় অনেক অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি এড়াতে পারতেন। ঈশ্বরের হাতে থাকলে কাল তিনি আপনাকে নিজের কাছেই টেনে নিতেন। আজ আর তাঁর প্রতি এত ভক্তি প্রকাশ করার অবকাশ জুটত না আপনার।'—বিকাশ জোর গলায় একটু চেপে চেপে হাসল। সিগারেট ধরিয়ে অনুসূয়াকে বোকা বানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে ছোটেলাল আর লছমনিয়াকে ডেকে বাইরের ঘরে না শুয়ে ভিতরের ঘরে শুতে বলল বিকাশ। এত শীতে ঘরে বেশী লোক না শুলে নাকি শীত কাটতে চায় না। তাই লছমনিয়াকে শুতে হল অনুসূয়ার ঘরে। ছোটেলাল বিকাশের ঘরে শুতে রাজি হল না।

রাত বেড়ে চলে, ঘুম আসতে চায় না বিকাশের। বিছানায় উসখুস করতে থাকে। হঠাৎ তার কানে চাপা কণ্ঠ ফিসফিসিয়ে ওঠে: 'সাহেব।'

বিকাশ মুখ তুলে সামনে তাকিয়ে দেখল ছোটেলাল। চুল্লির আলোয় তার মুখখানা রক্তিম দেখাচ্ছে। চুপিচুপি বিকাশ জবাব দিল, 'কিঁউ ছোটেলাল?'

'সকালে আপনি বলেছিলেন, এই লেড়কি খোসলার খোঁজে এসেছে?'

'হ্যাঁ, কেন ?'

'খোসলা তো ভাল লোক নয় সাহেব। আমার মনে হয় লেড়কিকে ফাঁসিয়েছে।'

'কি রকম ?'

'আপনার কাছে কি আর বলব সাহেব, অনেক দিন তার নিমক খেয়েছি, কিন্তু আমি জানি সাহেব সে লোক ভাল নয়। এখানে থাকতে নিত্য নতুন মেয়ে নিয়ে আসত, মদ খেত। লুচ্চা ছিল সাহেব, আমার কাছ থেকে তিরিশ টাকা ধার নিয়েছিল আর ফেরৎ দেয় নি। সে চলে যাবার পর অনেক মেয়ে আসত তার খোঁজে, অনেক পাওনাদার।'

বিকাশ বিছানায় উঠে বসল, 'সত্যি বলছ ?'

'আপনার কাছে কি মিথ্যা বলতে পারি! আর মিথ্যা বলে আমার লাভই বা কি বলুন। সকালে আপনি খোসলা সাহেবের খোঁজ করছিলেন বলে এত কথা বললাম।'

'আচ্ছা ঠিক হ্যায়। এখন যাও শুয়ে পড়গে।'

ছোটেলাল কামরা থেকে চলে যাবার পর বিকাশ বালিশের তলা থেকে সিগারেট আর দেশলাই বার করে ধূমপান করতে করতে ভাবতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটা।

অনুসূয়ার কাছ থেকে তার কাহিনীটা শোনবার পর থেকেই এ সন্দেহ তার মনে জেগেছে। খোসলা সাদা মন নিয়ে ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠতা করে নি। করলে নিজের পরিচয়টা সযত্নে গোপন করত না। কিন্তু এখন উপায় কি ?

প্রথমত খোসলা যদি ফিল্ড সার্ভিসে গিয়ে মারা গিয়ে থাকে তাহলে না হয় তার দেশে গিয়ে তার বাপ-মাকে দিয়ে অনুসূয়াকে এবং তার শিশুকে স্বীকার করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, তবে স্বীকৃতি পাওয়ার আশা একেবারে নেই বললেই চলে। বিবাহের কোন প্রমাণ নেই, নথিপত্রও নেই, কারণ বিবাহ হয়নি। এ অবস্থায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কোন লোক কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না এ ব্যাপারটা। মাঝে পড়ে আরও গ্লানি এবং অপমানের মধ্যে ডুবতে হবে অনুসূয়াকে।

আর যদি খোসলা বেঁচে থাকে এবং সমস্ত ঘটনাটা একেবারে অস্বীকাব কবে তাহলে তো চরম সর্বনাশ।

অনুসূয়ার উপর বিরূপ হতে চায়না বিকাশ, তবুও তার মনে হয় এত বড় বিপর্যয়ের জন্য দায়ী অনুসূয়াই। আগে বিয়ে করে নিলেই পারত। লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা মেয়ে, সব দিক বিবেচনা করার বয়স তার হয়েছে। কেন যে মেয়েরা এত বোকা হয়।

ঘুম এল তার গভীর রাত্রে। ভোরে উঠে চলে গেল হাসপাতালে। তখন ছোটেলাল ছাড়া আর সবাই ঘুমন্ত।

দুপুরে খেতে এসে দেখল অনুসূয়া সম্পূর্ণ নতুন বেশে। স্নানের পর প্রসাধনও করেছে একটু। চেহারায় বেশ ঔজ্বল্য। মনের ভার যেন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে তার। সাড়ী পরেছে বাঙালী মেয়ের মত।

খাবার টেবিলে বিকাশ বলল যে, সে ছুটির দরখাস্ত করেছে। পেলেই লক্ষ্ণৌ যাবে। বিকাশ লক্ষ্য করল অনুসূয়ার গরম জামা কাপড়ের অভাব। এখানে যে এত ভীষণ শীত এ খবর ওর ভাল করে জানা ছিলনা তো।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার আগে সহর থেকে একটা মেয়েদের ওভারকোট কিনে নিয়ে এল।

'পরে দেখুন।'

'কে ? আমি ? কেন বলুন তো ?'—অনুসূয়া বিস্মিত হল।

'তবে কি, মেয়েদের কোট তো আর আমি পরতে পারি না।'

'না না, কি দরকার ছিল···' সলজ্জভাবে আপত্তি করল অনুসূয়া।

'দরকার এই যে ওটা না পরলে এখানে শীতের হাত থেকে রেহাই নেই। নিন পরে ফেলুন। আন্দাজে এনেছি ছোট বড় হলে কাল বদলাতে হবে।'

কোটটা পরতে পরতে অনুসূয়া বলল, 'কিনেছেন ভালই, টাকাটা কিন্তু আমি দেব।'

'টাকাও এনেছেন নাকি অনেক ? আপনি তো দেখছি বড়লোক।'

'না না বড়লোক নই। একলা বেরিয়েছি, তাই শ' ছয়েক টাকা সঙ্গে ছিল। এখনও আমার কাছে শ' পাঁচেক আছে বোধ হয়।'

'বাপরে, অনেক টাকা! ও তো আপনার ছবার লক্ষ্ণৌ-আম্বালা করতেই খরচ হয়ে যাবে। বুদ্ধি-শুদ্ধি আপনার একেবারেই নেই দেখছি।'

কোটটা ওর গায়ে ফিট করেছে। নীচের তিনটে বোতাম লাগিয়ে বিকাশের দিকে মুখ তুলে 'কি রকম দেখাচ্ছে' গোছের হাসি হাসল অনুসূয়া। বিকাশ ওর আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলিয়ে মুখে বলল, বেশ হয়েছে, কিন্তু মনে মনে ভাবল, মেয়েটির গড়ন চমৎকার। যা পরে' তাইতেই মানায়।

টাকা নিল না বিকাশ, বলল, 'টাকা খরচ করবার অনেক সুযোগ পাবেন, এখন নাই বা করলেন।'

ছুটির অপেক্ষায় এমনি কাটল ছচার দিন। ইতিমধ্যে তাদের সম্পর্কের সঙ্কোচ অন্তর্হিত হয়েছে ধীরে ধীরে। এক বাড়ীতে বাস করে ছজনে ছজনকে চিনে ফেলেছে অনেকখানি। চঞ্চল প্রকৃতির চনমনে মেয়ে অনুসূয়া। চুপ করে বসে থাকতে পারে না এক মুহূর্ত। কখনও ছোটেলালের সঙ্গে বাগানের মাটিতে নীড়েন দেয়, কখনও বা রান্নাঘরে গিয়ে তাকে সাহায্য করে, আবার কখনও বা লছমনিয়ার চুল বেঁধে দেয় নতুন ফ্যাসনে। ঘরের সাজসজ্জা বদলায় নিত্য নতুন কায়দায়। ছপুর বেলায় যখন বিকাশ বাড়ী থাকে না, তখন ছোটেলাল আর লছমনিয়াকে ডেকে

পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়। বলে, 'সাহেবকে খবর্দার বোলো না আমি পিয়ানো বাজাতে পারি।'

'কেন মেমসাহেব ?'

'সে অনেক ব্যাপার, পরে বলব।'

গীটারে সেতারের বোল বাজায় কখনও কখনও। ছোটেলাল তবলা নিয়ে বসে কিন্তু বেশীক্ষণ চলে না। অনুসূয়ার চোখ থাকে বাইরে, কখন আবার বিকাশ না এসে পড়ে। তাই হঠাৎ বাজনা বন্ধ করে ফুলের তোড়া তৈরী করে ফুলদানীতে বসায়।

ওর স্বভাবের মধ্যে উদ্দাম ছেলেমানুষী আছে বুঝতে পারে বিকাশ। বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে পা মচকে ফেলেছিল। লছমনিয়া ডক্তারী করে এমন টানাটানি করেছে পা ধরে যে হাটু পর্যন্ত ব্যথা হয়ে গেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিকাশ দেখে ওর সরল উচ্ছলতা। এ মেয়েকে সত্যিই যদি কেউ ঠকিয়ে থাকে তাহলে খুব অন্যায় করেছে।

অনেক দিন বাদে সন্ধ্যায় পিয়ানোর সামনে বসল বিকাশ। পিয়ানো তার আসে না অথচ পিয়ানোর সুর ওর কাছে রোমান্টিক আবেদন নিয়ে আসে। খুব ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে শিলংএ বেড়াতে গিয়ে যে বাড়ীতে তারা উঠেছিল, সেটা ছিল এক চা বাগানের মালিকের আবাস গৃহ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মেমসাহেব। সেই বাড়ীতে প্রথম পিয়ানো শুনেছিল। বাজিয়েছিলেন মেমসাহেব স্বয়ং। আজও যেন

তার মনে সে সুর বেজে ওঠে অন্যমনস্ক মুহূর্তে। কে জানে কোথায় আছেন সেই চা-মালিক আর তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী? বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনেক অধ্যায়ের যেন পরিসমাপ্তি হয়েছে। বিকাশের মনে পড়ে খুব ছেলেবেলার কথা। দিনগুলোকে সোনার খাঁচায় ধরে রাখা যায় না। এযে কতো বড়ো ব্যথা মানুষের জীবনে! সুখ দুঃখ সব স্মৃতি যেন মর্মগ্রাসী বিষাদের সুরে বাঁধা। শুধু কাঁদাতে চায় অকারণে।

'কই বাজান, চুপ করে বসে রইলেন কেন?'

বিকাশ মুখ ফিরিয়ে দেখল অনুসূয়া ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে।

'পিয়ানো আসেনা আমার।'

'তাকি হয়, পয়সা খরচ করে এনেছেন। জানি না বললে শুনবে কেউ? বাজান না একটু শুনি।' অনুনয়ের সুরে কৌতুক মিশিয়ে বল্‌ল অনুসূয়া।

বিকাশ ঘুরে বসে বলল, সত্যি জানি না। ষ্ট্রোক দিতেই জানি না। কিন্তু ভারী সখ শিখি। মাষ্টারই পাচ্ছি না।

'সত্যি বলছেন, মাষ্টার পাচ্ছেন না?'

'সত্যি।'

অনুসূয়া মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে বলল, 'তাহলে বেশ, আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত করুন।'

'জানেন নাকি আপনি ? হু-র-রে, শোনান শোনান একটু। এযে দেখছি প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মত। আপনি রয়েছেন বাড়ীর মধ্যে এত কাছে আর আমি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি বাইরে।'

বিকাশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বল্‌ল, আপনার তো দেখছি গুণের অন্ত নেই।'

'না না যা ভাবছেন তা নয়। সামান্য বাজাতে পারি মাত্র।'

'তাই বাজান। সামান্য অসামান্য হতে কতক্ষণ।'

দুজনেই হেসে উঠল তারা।

অনুসূয়া বসল টুলে। বিকাশ পিয়ানোর পেছনে গিয়ে তাব মুখোমুখি দাঁড়ালো। দুই একটা ষ্ট্রোক দিয়ে অনুসূয়া বলল, 'বাঁধতে হবে, সময় লাগবে, আপনি ততক্ষণ ওঘরে গিয়ে খবরেব কাগজ পড়ুন। নইলে···নইলে···ভারী লজ্জা পাচ্ছি।'

বিকাশ চোখ বড় বড় করে চেঁচিয়ে হেসে উঠল, 'লজ্জা পাচ্ছেন। আচ্ছা আমি রান্নাঘর থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি ততক্ষণ।'

মিনিট কুড়ি বাদে দরজা ফাঁক করে বলল, 'আসতে পারি ?'

'আসুন। যদি ভাল না লাগে হাসতে পারবেন না।'

'ভাল না লাগলে কাঁদব আর ভাল লাগলে হাসব।'

'না সত্যি ঠাট্টা নয়, কথা দিন হাসবেন না।'

'দিলাম।'

'তাহলে শুনুন একটা ইটালিয়ান সুর। অন্ধ এক গায়ক তার প্রিয়ার মৃত্যুর পর রচনা করেছিলেন। ভেনিসের সমাধিক্ষেত্রে যেখানে তাঁর প্রিয়াকে মমাধিস্থ করা হয়েছিল তার ওপর ছায়া দিত একটা চাঁপার শাখা। প্রতিদিন তিনি গিয়ে বসতেন সেই সমাধির পাশে। গাছের ফুল ঝরে পড়ত তাঁর গায়ে, আর প্রিয়ার সমাধির উপর। দৃষ্টিশক্তিহীন কবি ভাবতেন ফুলগুলো যেন তারই বেদনায় কাতর চাঁপার অশ্রুবিন্দু। তিনি গান রচনা করলেন ঃ

কেন কাঁদ তুমি চাঁপা
জলে যায় আঁখি ভরে—

কুড়ি মিনিট পিয়ানোর আগাগোড়া মন্থন করে এক অপূর্ব সুর ঝঙ্কারে ভরে তুলল ঘরের আবহাওয়া। চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল ভেনিস সহরের সেই অন্ধ গায়ক আর তার মৃত প্রেমিকা, সমাধিস্থল আর চাঁপার অশ্রু। কিন্তু তার চেয়েও বেশী আশ্চর্য পিয়ানোর টুলে বসা অর্ধ পরিচিতা মেয়েটি। ওর নিজের সুরের পাখায় ভর করে ও যেন পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দূরে উঠে গেছে। প্রশান্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে মুখটা, চোখ দুটি আবিষ্ট। ওর আশে পাশে সব কিছু যেন বিস্মৃতির সীমা পেরিয়ে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চঞ্চল আঙ্গুলগুলো কখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে পিয়ানোর উপর নিজেরই খেয়াল নেই। পাথরের

মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে আছে। গভীর একাগ্রতায় উন্মুখ হয়ে যেন আত্মস্থ করছে নিজের সুরের রেশ। বিকাশ কথা বলল না। পবিত্র আবহাওয়াটাকে ভাষার কর্কশতায় মলিন করতে চায় না সে। আবেশময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনুসূয়ার মুখের দিকে। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, প্রশংসা কিছুই সরল না তার কণ্ঠ দিয়ে। ছোটেলাল আব লছমনিয়া কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে।

হঠাৎ চারিদিকে তাকিয়ে চোখের পলকে টুল থেকে ওঠে দাঁড়ালো অনুসূয়া। মুখে তার কালো ছায়া পড়েছে।

বিকাশ বলল, এঞ্জেলিক....সুপার্ব...

'ঠাট্টা করবেন না, ঠাট্টা করবেন না, প্লিজ।'

অনুসূয়া বিকৃত কণ্ঠে বিকাশের প্রশংসার জবাব দিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। বিকাশ বুঝল না কোথায় কেটেছে তাল। অপ্রত্যাশিত জবাবে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। এমন একটা চমৎকার বাজনার পর কেউ প্রশংসা করলে সেটা ঠাট্টা হয়ে ওঠে কোন নিয়মে তা সে ভেবে পেল না। ভারী অদ্ভুত প্রকৃতি তো অনুসূয়ার! প্রথমে তার অভিমান হল, তারপর হল রাগ। পৃথিবীতে কি ঠাট্টা করার লোক আর কেউ নেই তার? কোথাকার কোন অপরিচিতা, অজ্ঞাতকুলশীল মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা না করলে যেন তার পেটের ভাত হজম হবে না। মেয়েটির আত্মম্ভরিতাও কম নয়।

'সাব, মেমসাব রো রহী।'

'রোনেওয়ালীকো রোনে দেও। মায় ক্যা করু।'—ছোটেলালকে ধমকে দেয় বিকাশ। কাঁদুক গে যার খুশী যেমন। কাঁদবে বইকি। না কেঁদে উপাই বা কি। খোসলার নাম ধরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে। বিকাশ মনে মনে কঠিন হয়ে উঠতে চায় ওর উপর।

মিনিটের পর মিনিট কাটতে থাকে দুঃসহ স্তব্ধতায়। একটু একটু করে সিগারেট ছাই হয়ে চলেছে। সেই দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিকাশ। হঠাৎ একসময় যেন কানের পর্দায় কান্নার সুর তাকে চমকে দেয়। সত্যিই কাঁদছে নাকি? ওর কান্নার আওয়াজ এঘরেও আসতে পারে নাকি? কান পেতে থাকে। এবার যেন হাজার দীর্ঘশ্বাস কানের মধ্যে ঝড় বইয়ে দিতে চায়। কিন্তু কেন কাঁদছে? সন্ধ্যায় অত হাসিখুশি চটপটে ভাব, হঠাৎ পিয়ানোর তারে আঘাত করে ওর কান্নার দ্বার উন্মুক্ত হল কেন? চেয়ার ছেড়ে এক মিনিট ঘরে পায়চারী করে সে পাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। বালিসে মুখ গুঁজে সত্যই ফুলে ফুলে কাঁদছে অনুসূয়া তবে এই কান্নার সুর নিশ্চয়ই তার কানে বাজেনি, ওটা নিতান্তই মনের ভ্রান্তি। বিকাশ ওর অজ্ঞাতেই আবার ফিরে এল নিজের ঘরে। ওর সম্বন্ধে বেশী ঔৎসুক্য প্রকাশ করবে না সে। যে কাজে এসেছে এখানে, সেই কাজ সেরে চলে যাক—ব্যাস।

বেশী মাখামাখি করবার কোন প্রয়োজনও নেই, কোন সার্থকতাও নেই। ইচ্ছে হয় কাঁদুক, ইচ্ছে হয় হাসুক, যা খুশী তাই করুক।

বেশী রাত্রে খাবার টেবলে আবার তাদের দেখা হল। বিকাশ গম্ভীর নীবব। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাতে লাগল অনুসূয়ার দিকে। ওর চেহারায় কোথাও কান্নাকাটির চিহ্ন নেই, প্রায় অন্যদিনের মতই স্বাভাবিক তবে একটু গম্ভীর।

হঠাৎ অনুসূয়া চুপিচুপি বলার মত করে বলল, 'আপনি আমায় ক্ষমা করুন ক্যাপ্টেন মজুমদার।

বিকাশ বলল, 'কিসের ক্ষমা ?'

'সন্ধ্যার ঘটনার জন্য। আমি আপনার উপর রূঢ় ব্যবহার করেছি।'

'আমি কিছু মনে করিনি, করেই বা লাভ কি।'—বিকাশ নিজের বিরক্তি চেপে রাখতে চায় না।

'আপনি মনে না করলেও এটা তো ঠিক যে আমি অন্যায় করেছি।'

'বুঝতে পেরেছেন ?'—বিকাশ শ্লেষ মিশিয়ে বলল।

অনুসূয়া শ্লেষের জবাব না দিয়ে বলল, 'আমায় ক্ষমা করুন ক্যাপ্টেন মজুমদার। ছেলেবেলা থেকে হাল্কা আবহাওয়ায় মানুষ, তাই সেই দিকেই আমার ঝোঁক বেশী। নিজের বর্তমান অবস্থার কথা মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই। হঠাৎ

যখন মনে পড়ে তখন মনের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া হয়। আমি জানি আপনি আমাকে ঠাট্টা করেন নি তবুও তখন আমার মনে হয়েছিল ঠাট্টা। এতবড় বিপদ মাথায় নিয়ে যে মেয়ে হেসে গেয়ে বেড়ায় তাকে ঠাট্টা ছাড়া আর কি করতে পারে মানুষ—এই আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই তো আপনি ঠাট্টা করেন নি। প্লিজ ক্যাপ্টেন, প্লিজ আমায় ক্ষমা করুন।'

বিকাশ অন্যদিকে তাকিয়ে উদাস ভাবে বলল, 'কারও মনের ওঠানামা নিয়ে মাথা ঘামাবার আগ্রহ আমার নেই। ক্ষমা চাইবারও কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ ব্যাপারটাকে আমি মনের মধ্যেই নিইনি।'

'প্লিজ প্লিজ ক্যাপ্টেন......'

বিকাশ মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কেন ছেলেমানুষী করছেন। আমি আপনার উপর রাগ করিনি।'

'সত্যিই বলছেন?'

'এতদিন এখানে বাস করে কি এই বুঝলেন যে আমি খুব মিথ্যা বলি?'

'মোটেই নয়। আপনার মত সৎ উদার···।'

'ব্যাস ব্যাস। আর বেশী বললে তোষামোদের মত শোনাবে।' বিকাশ হাসল।

সেই রাত্রে শুয়ে শুয়ে নভেলের পাতা ওল্টালেও এক লাইনও পড়তে পারল না বিকাশ। অনুসূয়া তার চিন্তাটা

আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাশের ঘরে অনুসূয়াও বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল। এক সময় তার বুক ছাপিয়ে চোখে জল এসে পড়ল। কি অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়েই না তাকে চলতে হচ্ছে। এ ভাল নয়, শোভন নয়, আত্ম-মর্যাদানুগ নয়। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। ছোট্ট একটি শিশুর ভ্রুণ তার রক্তমাংসের ভাগ নিয়ে তারই দেহের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। তার জীবনের সমস্ত কামনা মন্থন করা সৃষ্টি। অবচেতনভাবে পেটের উপর হাত দিয়ে সে অনুভব করতে চেষ্টা করে ভ্রুণের অস্তিত্ব। দেহের উত্তাপ আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের ওঠানামাকে আচমকা তার মনে হয়, হবু শিশুর উত্তপ্ত স্পন্দন। এ শিশু জন্ম নেবে তারই দেহ থেকে, তারই বুকের দুধ খেয়ে আয়ু সংগ্রহ করবে। বুকটা তার হঠাৎ ভারী ভারী লাগে। দুই হাতে নিবীড়ভাবে স্পর্শ করে সে যেন অনুভব করতে চায়, বুকে তার নতুন শিশুর প্রাণের উৎস সঞ্চারিত হয়েছে কিনা। ও শিশু তারই সেবা যত্ন লালন পালনের মধ্য দিয়েই বড় হয়ে উঠবে—হ্যাঁ হবে বই কি। একটা কিছু অসাধারনত্ব থাকবে তার মধ্যে। খোসলার মত লম্বা চওড়া সুন্দর সুপুরুষ হবে। শিক্ষা দীক্ষায় হবে মা বাবার সংমিশ্রণ। সরস মাতৃত্বের আবেশে মধুর ঝিম লাগবার মুহূর্তে হঠাৎ দপদপ করে ওঠে মাথার শিরা গুলো। খোসলা তার জীবনের পবিত্রতম, সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠতম দিন গুলোকে এমন হৃদয়হীনের মত মসিলিপ্ত করে

দিচ্ছে কেন ? সদর্পে বুক ফুলিয়ে যখন তার লোকালয়ে বেড়িয়ে বেড়াবার কথা তখন তাকে আত্মগোপন করে পথে পথে অনুগ্রহজীবির মত ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে কেন ? একটা চিঠি লিখেও যদি সে জানাত কোথায় আছে, তাহলে অন্ততঃ সুখবরটা পাঠিয়ে তার রণক্ষেত্রের সহস্র ক্লান্তিভরা দিন-গুলোকে রঙিন নেশায় ভরিয়ে দিতে পারত অনুসূয়া— না না তার কোন অমঙ্গল হয় নি। মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, তিনি এত অবিচার করতে পারেন না। তার এত ভালবাসা (ভালবাসা তো স্বর্গীয়) শূন্যতায় বিলীন হতে পারে না। ঈশ্বর মানুষের মনে ভালবাসা দিয়েছেন। সেই ভালবাসা যাতে সার্থক হয়ে ওঠে, সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। খোসলা যেখানেই থাকুক, ফিরে তাকে আসতেই হবে অনুসূয়ার কাছে। ভগবান তাদের দুটি জীবন বেঁধে দিয়েছেন সন্তানের বন্ধন দিয়ে। দুটি জীবন এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে পরম স্রষ্টার এষণাকেই যে সার্থক করছে। দুই হাত জোড় করে ঠাকুর গণপতিকে প্রণাম করে অনুসূয়া।

পাশের ঘরে আলো জ্বলছে এখনও। কি করছে লোকটা ? কোন দিন তো এত রাত জাগে না। অনুসূয়া কৌতুহলী হয়ে ওঠে। বিছানা ছেড়ে পা টিপে টিপে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর সামান্য একটু ফাঁক করে দৃষ্টি প্রসারিত করে। কি আশ্চর্য, বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। খোলা বইটা হাত দিয়ে চাপা রয়েছে বুকের উপর। আলো নেভাতে

ভুলেই গেছে। কি আর করা যাবে, জ্বলুক আলো সারা রাত্রি। আবার বিছানায় শুয়ে লেপ চাপা দিল অনুসূয়া। তার পাশেই খাটিয়ার উপর নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে লছমনিয়া।

সন্ধ্যার কথাটা মনে পড়ে অনুসূয়ার। এ'কদিন বেশ ভাল করেই গৃহস্বামীকে দেখবার অবকাশ পেয়েছে। তরুণ বাঙালী ডাক্তার। খেসলার চেয়েও বয়সে ছোটই হবে। চোখেমুখে কেমন একটা উদাসীন ভাব, মনটা খুব উঁচু বলেই মনে হয়। চালচলন মার্জিত। বাঙালী নামের সঙ্গে যে পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতির আভাস জেগে ওঠে মনে, তারই হুবহু প্রতিচ্ছবি। নরম প্রকৃতির মানুষ। মিলিটারী পোষাকে ওকে বে-মানান লাগে। বাঙলাদেশের এমনি ছেলে মেয়েরাই শাসকদের উপর বোমা চালায়, রিভলভার ওড়ায় গভর্ণরের উপর। তারপর প্রয়োজন হলে নিজেদের উপরও। লোকটা এত ভাল যে অনেক সময় বিস্মিত হতে হয়। সর্বদাই 'গায়েপড়া অতিথিকে' সর্বপ্রকারে সুখী রাখার জন্য ব্যাকুল। তার চরম সঙ্কটের দিনে এমন একটি লোকের আশ্রয় পাওয়ার মধ্যেই কি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত নেই? ও ছাড়া আর কে খোসালর খোঁজ দিতে পারত? দিল্লীর জেনারেল হেড কোয়ার্টারে সেকেন্দ্রাবাদ থেকে দুখানা চিঠি লিখে সে জবাব পায়নি। সম্ভবতঃ সামরিক অফিসারদের গতিবিধি গোপন রাখাই সরকারী কানুন। এ অবস্থায় মজুমদারের মত

মিলিটারী অফিসার ছাড়া আর কেই বা তাকে সাহায্য করতে পারত ?

মাথার উত্তেজনা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে এক সময় তার চোখেও ঘুম নেমে এল।

পরদিন থেকে বাড়ীর আবহাওয়া হঠাৎ থমথমে হয়ে উঠল। দুপুরে খাবার টেবলে নিছক কুশল ছাড়া একটি বাড়তি কথারও আদান প্রদান আর হয়না। বিকেলে বেশ একটু রাত করে বাড়ী ফেরে বিকাশ। খাওয়া সেরে সে সোজা চলে যায় নিজের কামরায়। প্রয়োজনের অধিক একটি মুহূর্তও বিকাশ যেন অনুসূয়ার সঙ্গে ব্যয় করবে না।

অনুসূয়ার বুঝতে কষ্ট হয় না। গম্ভীর হয়ে ওঠে সেও। তিন দিনেই তার সমস্ত উচ্ছলতা উবে যায়। অনিচ্ছুক মানুষের সঙ্গে একই সংসারে বাস করার মত দুর্বহ হয়ে ওঠে সমস্ত মুহূর্তগুলো। মনে মনে অভিমান ফুসে ওঠে, কি এমন অন্যায় সে করেছে যে তাকে এভাবে এড়িয়ে চলে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ? মাঝে মাঝে দুপুরে বসে তার কান্না পায়, নিজের দুঃখে নয়, বিকাশের ব্যবহারে।

আরও কটা দিন গেল এমনি। একদিন সন্ধ্যায় ছোটেলাল বলল, ‘সাহেব, মেম সাহেব কাল চলে যাবেন।’

বিকাশ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, ‘সে কি হে ?’

'হ্যাঁ সাহেব সত্যি। কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়েছেন। লছমনিয়াকে পাঁচ টাকা বকশিস দিয়েছেন, আমায় বলেছেন সকালে একটা টোঙ্গা ঠিক করে দিতে।'

'তাই নাকি ?'

বিকাশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সে ছুটি পাবে সামনের সপ্তাহে, তার আগেই এখান থেকে ওর চলে গিয়ে লাভ কি ? হঠাৎ কি হল ব্যাপারটা ?

তাড়াতাড়ি গিয়ে অনুসূয়ার দরজায় টোকা মারল।

'খোলা আছে।'

কবাট খুলে বিকাশ দেখল জানলার সামনে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দরজার দিকেই তাকিয়ে আছে অনুসূয়া।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'—অনুসূয়া এগিয়ে এল।

'ছোটেলাল বলছিল, আপনি নাকি কাল চলে যাচ্ছেন ?' —বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল বিকাশ।

অনুসূয়া বলল, 'বসুন। হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম। কালই যাব।' গম্ভীর মুখ, দৃঢ় কণ্ঠ। অনেক ভেবে চিন্তেই যেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'কোথায় যাবেন ?'

'যে দিকে দুচোখ যায়।'

'হঠাৎ এরকম বে-পরোয়া হওয়ার মানে ?'

'মানে, এখানে আপনার অসুবিধা হচ্ছে—এই আর কি।'

বিকাশ বিস্মিতভাবে বলল, 'আমার অসুবিধা হচ্ছে! কই সে কথা তো একবারও বলিনি।'

'সব কথা মুখে বলবার প্রয়োজন হয় না। প্রথম থেকেই তো আপনার আপত্তি ছিল। আমিই যেন জোর করে আছি। কি করব, উপায় তো ছিলনা কিন্তু গত কয়েক দিনে বুঝেছি এখানে আর আমার থাকা উচিত নয়।'

শেষ দিকে তার গলা ধরে এল। হৃদয়াবেগ সম্বরণ করবার জন্য সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'এ আপনি কি বলছেন—আমি—'

'আপনার সহৃদয়তা অবিস্মরণীয় কিন্তু এও ঠিক যে অনুগ্রহ ভিক্ষা করা চলে, দাবী করা চলে না। ভিক্ষা দিতেও আপত্তি দেখা দিলে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে ভিখারীর বিমুখ হয়ে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। গত কয়েকদিন আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেন না, এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন, সব সময় মুখ গম্ভীর করে থাকেন। পুরুষ হলে হয়ত অনেকদিন আগেই দরজা দেখিয়ে দিতেন। নিতান্ত মেয়ে তাই পারছেন না।'

বিকাশ স্তব্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। অনুসূয়ার অভিযোগ যে কত বড় মিথ্যা তা সে জানে খুব ভাল করেই। একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। রাগে অভিমানে তার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। বলল, 'মনগড়া অভিযোগ খাড়া করে কোন লোককে হেয় করার মধ্যে কোন গৌরব নেই। আপনি আমাকে চেনবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছেন। মিথ্যা কথা

গুলো উচ্চারণ করবার আগে গলায় বেধে যাওয়া উচিৎ ছিল। যাই হোক, আপনি যেতে চাইলে বাধা দেবার কিছু আমার নেই তবে আরও কটা দিন থেকে গেলে বোধ হয় আপনার ক্ষতি হত না, কারণ আমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। সামনের সপ্তাহে আমার জায়গায় লোক এলেই আমি ছুটি পাব।— আর যদি নিজের অজ্ঞাতে কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে ক্ষমা করবেন। এ ছাড়া আর আমার কিছু বলবার নেই।'

পেছন ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই অনুসূয়া দ্রুতপায়ে এসে তার পথ আটকে একেবারে বুকের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো, প্লিজ প্লিজ যাবেন না। বিকাশ সোজা তাকালো তার দুটি চোখের উপর। মূহূর্তেই তার সমস্ত শিরায় শিরায় রক্তের উত্তপ্ত সঞ্চালন সুরু হয়ে গেল। কি কাজে এবং কেন যে সে এঘরে এসেছিল এবং কি যে সে বলল এই মাত্র সব কিছুই যেন তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল গর্ভে। ভেসে আছে শুধু অসীম রহস্যময় দুটি চোখ আর সেই চোখের নিবিড় তিমির তলে কাঁপছে আত্মার উদ্দীপ্ত শিখা। ভাবাবেশে মুগ্ধ বিকাশ অপলক তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। দুজনের মুখের ব্যবধান ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। ওর চোখের কালো তারার সুক্ষ্ম কারুকার্যের স্পর্শ যেন পেতে চায় ওর কামনা বিধুর ঠোঁট দুটি। অনুসূয়াও যেন সম্মোহিত হয়েছে ওর দৃষ্টির নেশায়। নড়বার ক্ষমতা নেই যদিও কেউ ধরে রাখেনি তাকে।

পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের ঘড়িতে বাজল প্রহরের ঘণ্টা। সেই শব্দ কানের পর্দায় এসে আঘাত করতেই বিকাশ ছিটকে বেরিয়ে এল অনুসূয়ার কামরা থেকে। আর হঠাৎ-সচেতন অনুসূয়া একই জায়গায় একই অবস্থায় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট। বুকের মধ্যে অসহ্য কাঁপুনি। একটি মুহূর্তে শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে, এখনই যেন পড়ে যাবে মাটিতে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজল।

সেইরাত্রে ছোটেলাল পড়ল বিপদে। দুই ঘরে দুজনে শুয়ে আছে বিছানায়, কথা বলে না, খাবার চায় না। এদিকে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের প্রচণ্ডতা বাড়ছে। ডাকাডাকি করতে গেলে চটে যেতে পারে। সাহেব মেমদের মেজাজ খুব তাড়াতাড়ি ওঠানামা করে। ওদিকে লছমনিয়া খেয়ে দেয়ে নিজের কামরায় ঝিমুচ্ছে। একটু রাত বাড়লেই তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে মেমসাহেবের ঘরে পাঠানো এক বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। তাই শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করতে হল তাকে। বিকাশের কামরায় ঢুকে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সে বলল, 'বহুত রাত হুয়া সাহেব। আপকা খানা লাগাউঁ ক্যা ?'

বিকাশ মুখ তুলে বলল, 'খানেকো জি নেহি চাহ্তা। তবিয়ৎ ঠিক নেহি। তুমলোগ খা লেও।'

তবিয়ৎ খারাপ শুনে ছোটেলালের উদ্বেগ বেড়ে গেল। শীতকালে এখানে ভীষণ রকমের বসন্ত হয়। সিটিতে ইতিমধ্যেই বসন্তের মড়ক লেগেছে সে জানে। সাহেবের খারাপ তবিয়ৎ কোথায় যাচ্ছে কে জানে। প্রশ্ন করল, 'কেয়া, বোখার হুয়া সাব ? হাত পাওমে দরদ হ্যায় ?'

'ভয় পাবার কিছু নেই। সামান্য একটু শরীর খারাপ হয়েছে মাত্র। মেমসাহেব খেয়েছেন ?'

'না সাহেব। ওনারও শরীর খারাপ বোধ হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই তো শুয়ে আছেন।'

'ওঁকে ডেকে খেতে বল। শরীর খাবাপ হয়নি, এমনিই শুয়ে আছেন হয়ত।'

মেমসাহেবও খেতে নাবাজ রাত্রে। তাঁরও নাকি 'তবিয়ৎ' ভাল নেই। অথচ তুজনেব কেউই বলছেন না তাঁদের জ্বর হয়েছে অথবা গা হাত পা ব্যথা করছে।

বিকাশকেই উঠতে হল অবশেষে। যে ঘটনা ঘটতে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল সন্ধ্যায় তার স্মৃতিকে মন থকে মুছে ফেলতে হলে এমনি গুমোট আবহাওয়াকে বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না। অশোভন কিছু একটা ঘটে ওঠবার অবকাশ পায়নি, শুধু নিজের তুর্বলতা হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছিল; কিন্তু তুর্বলতা জয় করার শক্তিও যে তার আছে, তাও তো প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই এমন অপরাধীর মত ভাব করে অস্বাভাবিক

কিছু একটা করার অর্থই দাঁড়াবে সমস্ত ব্যাপারটাকে অপরাধের পর্যায়ে এনে দাঁড় করানো।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাসিখুশীর ভাব ফুটিয়ে সে অনুসূয়ার দরজার পাশ থেকে ডাকল, 'হ্যাল্লো, রাত্রে খেতে চাইছেন না কেন, আসুন আসুন।'

তার কণ্ঠস্বর শুনে অনুসূয়াও তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ সেও খুঁজছিল এমনি একটা সুযোগ। হাসিমুখে চেঁচিয়ে বলল, 'আসছি, আপনি বসুন গে।'

খাবার টেবলে বসে তারা তুচ্ছ কথায় অনাবশ্যক হাসাহাসি করল। কিছুই যেন হয়নি কোথাও। একেবারে জমজমাট নৈশ-ভোজ।

'আচ্ছা, আপনি তো কই আমাকে পিয়ানো শেখালেন না ?'

'ঘোড়াকে গায়ের জোরে জলের কাছ পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়, জল খাওয়ানো যায় না তার পিপাসা না পেলে।'

অনুসূয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল।

'বেশত জল পর্যন্তই টেনে নিন না ঘোড়াটাকে, তারপর খায় কিনা দেখা যাবে।'

'আচ্ছা কই, আপনি তো আমাকে বাঙলা শেখালেন না ?'

'বাঙলা শিখে কি হবে, তার চেয়ে ভাল করে পাঞ্জাবী শিখুন। ক্যাপ্টেন খোসলা খুশী হবেন।'

অনুসূয়ার মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল।

'কাল কি সত্যিই চলে যাবেন নাকি?' প্রসঙ্গ বদলায় বিকাশ।

'যদি যাই?'—উৎসুক নয়নে বিকাশের মুখের দিকে তাকালো অনুসূয়া।

'তাহলে খুব দুঃখিত হব।'

'আপনাকে আমি দুঃখ দিতে পারব না।' অনুসূয়া হাসল।

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দুজন হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর আবার স্বাভাবিক আবহাওয়া। আস্তে আস্তে অনুসূয়া বিকাশের নেশায় দাঁড়িয়ে গেল। সারাদিন হাস-পাতালে উসখুস করে। সুযোগ পেলেই সোজা চলে আসে বাঙলোয়। গেটের মুখে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখে বারান্দার রোদে পিঠ দিয়ে সদ্যস্নাতা অনুসূয়া এলোচুলে মোড়ায় বসে উল বুনছে। ওর উপস্থিতি টের পেলে সলজ্জ হেসে অভ্যর্থনা করে। কোন দিন সুন্দর একটা ফুলের বোকে বানিয়ে দেয়। বলে, কোটের কলারে লাগিয়ে নিন, বেশ মানাবে আপনাকে। আটকাতে দেরী হলে নিজেই এগিয়ে এসে বাট্‌ন হোলে

আটকে দেয় পরিপাটি করে। দূরে গিয়ে ভাল করে তাকিয়ে বলে, চমৎকার। বিকেলে বেশ একটু প্রসাধন করে। চোখের সীমানায় কাজলের রেখা টেনে দেয়, খোপায় লাগায় ফুলপাতা, কপালে কুঙ্কুম বিন্দু। নিজেকে সুন্দর করে সাজাবার কলা কৌশল ওর আয়ত্বাধীন। ব্লাউসের কাট ছাট আর কাপড় পড়ার ভঙ্গি দেখলেই তা বুঝতে পারে বিকাশ। নেশার চেয়েও তীব্রতব হয়ে উঠছে ওর আকর্ষণ। ওর হাসি, ঠাট্টা, কণ্ঠস্বর, ছেলেমানুষী, উচ্ছলতা—সবই অপূর্ব মাধুরীতে ভরে দিয়েছে বিকাশের হৃদয়। হাসপাতালে একা বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে যখন তার মন ভাবুক হয়ে ওঠে, তখন অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর কল্পনা ছুঁয়ে যায় ওর চিন্তাকে। অনুসূয়াকে একান্ত প্রিয়-জন বলে মনে হয় তখন। সারাদিন বাড়ীতে একা থাকতে ওর খুব কষ্ট হয় নিশ্চয়ই। ওব নিঃসঙ্গতার দুঃখ বিকাশকে ব্যথিয়ে তোলে। মন কেমন করে ওঠে অনুসূয়ার জন্য। যদি অনুসূয়া ওর স্ত্রী হোত তাহলে তাকে সে কিছুতেই আনত না এখানে, রেখে দিত কলকাতায় সহস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে, যেখানে সময় বয়ে যায় নদীর স্রোতের মত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে। হয়ত এখানে আসত সে মাঝে মাঝে বেড়াতে। তার শূন্য দিনগুলো ভরে উঠত ভালবাসার দেওয়া নেওয়ায়। বিকেলে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে বেরোতো। ম্যালের ঝাউ সারি, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পেরিয়ে চলে যেত তারা ব্রিটিশ

ইনফ্যান্ট্রি লাইনের সীমানার ময়দানে। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ক্লান্ত প্রেয়সীর ভারী দু'টি চোখের পাতায় চুমু দিয়ে মুছে দিত সব ক্লান্তি। পিয়ানোর টুলে বসে সে গানের সুরে দুলিয়ে দিত পিয়াল শাখার কোলে মালতীর লতা। তারপর একদিন বিদায় নিত চোখের জলে। বিকাশ স্ত্রীর অশ্রুসজল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু···কিন্তু—সে একি ভাবছে ?········

বিকাশ মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়। অনুসূয়াকে নিয়ে ভুলেও বউ-বাসন্তী খেলা উচিত নয় তার। অনুসূয়া হচ্ছে ক্যাপ্টেন ব্রিজনারায়ণের বাগদত্তা, তার সন্তানের জননী......টেলিফোন ·······এ মেসেজ ফ্রম ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স। ইয়েস্ এ্যাডজুটাণ্ট, ইণ্ডিয়ান মিলিটারী হস্পিটাল স্পিকিং।

'ব্রিগেডিয়ার বলছেন, আপনার জায়গায় ব্রিটিশ মিলিটারী হাসপাতালের ক্যাপ্টেন হিক্‌স্ অফিসিয়েট করবেন। কাল সকালে তিনি জয়েন করছেন। পরশু থেকে আপনার ছুটি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ছুটি পাওয়ার সংবাদে উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারল না বিকাশ। যদিও প্রথম প্রথম ছুটির জন্য আগ্রহে অধীর ছিল। ছুটির অর্থ হচ্ছে কাল বিকেলের ট্রেনে লক্ষ্ণৌ রওনা হয়ে খোসলার ঠিকুজি-কোষ্ঠী খুঁজে বার করে তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসা এবং চতুর্থ দিনে অনুসূয়াকে চির-

কালের মত বিদায় দেওয়া। অবশ্য সেইটাই সহজ, স্বাভাবিক, শোভন। তবুও কেমন যেন লাগে। গত কয়েক দিনেই রাগ-অভিমানের মধ্য দিয়ে কতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তারা। ছাড়াছাড়ি হলে নিশ্চয়ই মন কেমন করবে কিন্তু উপায়ই বা কি ?

দিনের আলো থাকতে থাকতে বিকেলেই বাড়ীমুখো রওনা হল বিকাশ। হাসপাতালের গেটে দেখা হল কমাণ্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল রঘুবীর সিং চৌবের সঙ্গে।

বিকাশ খাড়া হয়ে মিলিটারী স্যালিউট ঠুকলো। তিনিও প্রতি নমস্কার করলেন।

'ক্যাপ্টেন মজুমদার, লোকে বলছে তুমি নাকি বিয়ে করেছ এবং তোমার স্ত্রী নাকি খুব আকর্ষণীয়া মহিলা।' রসিকতার হাসি হেসে ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন চৌবে।

'কে বলল স্যার ? এ কথা সত্য নয়। আমি অবিবাহিত। তবে আমার বাসায় ক্যাপ্টেন ব্রিজনারায়ণ খোসলার এক বান্ধবী এসে আছেন। ব্রিজনারায়ণের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবেন। তাকে দেখেই হয়ত কেউ ভুল করে থাকবে।'

'সত্যি বলছ তো, না কি মিষ্টি খাওয়াবার ভয়ে চেপে যাচ্ছ।'

'আজ্ঞে না স্যার, এর মধ্যে চাপাচাপির কি আছে। আপনি আসুন না আমার বাঙলোয়, নিজে চোখে দেখতে পাবেন।'

লেঃ কঃ চৌবে এগিয়ে এসে ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'যাবার দরকার নেই। তোমার কথাই যথেষ্ট। তবে ভদ্রমহিলা যেই হোন, তাকে নিয়ে ছোকরা অফিসার মহলে খুব গাল-গল্প চলছে। ক্যাণ্টনমেণ্টে আকর্ষণীয় তরুণীর বিপদ অনেক, বিশেষ করে তোমাদের মত ব্যাচিলার অফিসারের সংখ্যা যেখানে খুব বেশী।'

চৌবে বিদায় নিলেন। অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে বিকাশ বাসার গেটে এসে পৌঁছালো। অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলোয় সমুজ্জ্বল বাঙলোর প্রাঙ্গন। সিঁড়ির উপর পা ঝুলিয়ে বসে একটা শাদা বিড়ালকে কোলে নিয়ে আদর করছে অনুসূয়া। তার পায়ের কাছে বসে সাড়ীর লাল পাড়টা পরীক্ষা করে দেখছে লছমনিয়া। বিকাশ অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। সাজগোজ করে কার প্রতীক্ষায় বসে আছে অনুসূয়া? নিশ্চয়ই খোসলার নয়। গেট খুলে সুরকির পথে দুই এক পা এগোতেই ওদের নজর পড়ল তার উপর।

লছমনিয়া উঠে সরে গেল আর অনুসূয়া বিড়াল কোলে এগিয়ে এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বলল, 'একি আপনার চেহারা এমন ম্লান দেখাচ্ছে কেন?'

বিকাশ নিজের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'কই না।'

'না বললেই কি চলে? মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখে ক্লান্তি। শরীর খারাপ হয় নি তো?'

গভীর তৃপ্তির আবেগ বিকাশের বুকে। শরীর তো তার খারাপ হয় নি। তবু চেহারায় কোথায় ম্লানতা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে অনুসূয়া। মানুষের সম্পর্ক কি অদ্ভুত! আজ তার জন্য অনুসূয়ার উদ্বেগের অন্ত নেই অথচ আর সাত দিন বাদে যখন সে বিদায় নেবে তারপর কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তার জন্য একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলবে না নিশ্চয়ই।

'কি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? ঘরে চলুন।' বিড়াল ছেড়ে দিয়ে শান্তভাবে বলল অনুসূয়া।

'চলুন, আজ সুখবর এনেছি আপনার। ছুটি কাল থেকে।' অনুসূয়া আগ্রহভরে তাকালো ওর মুখের দিকে। সুখবর অথচ উচ্ছ্বাস নেই বিন্দুমাত্র।

'কাল বিকেলের ট্রেনে যাব। খোসলার ফোটো থাকলে দিয়ে দেবেন একখানা আর তার সেকেন্দ্রাবাদ ত্যাগ করার তারিখটা। দু'তিন দিন একলা থাকবেন এই বাড়ীতে।'

'ছুটি তো পেলেন, কিন্তু আপনার শরীর ঠিক আছে তো?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর না থাকলেই বা আপনার কি। আজ আপনি আমার শরীর নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন, দুদিন বাদে ভুলেও মনে পড়বে না। মেয়েরা তো সাধারণত স্বার্থপর অকৃতজ্ঞই হয়।'

কথাগুলোকে রসিকতা প্রমাণ করবার জন্য জোর করে চেঁচিয়ে হেসে উঠল বিকাশ কিন্তু অনুসূয়ার কাছ থেকে কোন সাড়া পেল না। তার চোখে মুখে একটা বিষন্ন ভাব। গভীর

দৃষ্টিতে বিকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু যেন আবিষ্কার করতে চায় সে।

'ওরকম ভাবে তাকাবেন না, ঘাবড়ে যাব। আসুন চা খাওয়া যাক। কে জানে, হয়ত আজই আপনার সঙ্গে সান্ধ্য-চা খাওয়ার শেষ দিন।'

অনুসূয়া একটি কথাও বলল না। গম্ভীর চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। ওভারকোট ঝুলিয়ে রেখে টেবলে বসে অনুসূয়াকে ডাকল বিকাশ। অনুসূয়া বসল তার মুখোমুখি। ছোটেলাল চা নিয়ে এল। সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আর পুডিং।

'এ সব কে বানালো হে?'

'মেমসাহেব।'

'তাই নাকি?' ছোটেলালের দিকে তাকিয়ে বিকাশ বলল, 'মেমসাহেব অনেক জানেন, কিন্তু জানেন না কি করে ধরে রাখতে হয় খোসলা সাহেবকে।'

ছোটেলাল বুঝল না কিছুই। সাহেব আর মেমসাহেব ইংরাজিতে কথাবার্তা বলেন, কিছুই সে বুঝতে পারে না। শুধু কথার সুরে বুঝল ওটা রসিকতা। তাই একটু হেসে সাহেবকে খুশী করবার প্রয়াস পেল। কিন্তু অনুসূয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো বিকাশের দিকে।

ছোটেলাল চলে যেতেই সে বলল, 'ওদের সামনে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে কি সুখ পেলেন?'

বিকাশ বলল, 'কিছু বোঝেনি, ইংরাজী তো জানেনা।'

'আজ ইংরাজিতে বললেন, দুদিন বাদে দেশী ভাষায় বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলবেন। তখন আমি হব আপনাদের হাসির খোরাক, এখনও অবশ্য তাই-ই আছি। নিতান্তই এখানে কেউ নেই বলে হাসাহাসি করতে পারেন না। মেয়েরা স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ আর পুরুষরা ?'

বিকাশ স্যাণ্ডউইচে কামড় দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

'আচ্ছা আপাততঃ নারী পুরুষের চরিত্র বিশ্লেষণমুলক গবেষণা বন্ধ রেখে আসুন কালকের প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলি। রাত ন'টা পয়ত্রিসে ক্যালকাটা মেল ধরে যেতে হবে। ওখানে পৌঁছাবো পরশু দুপুরে। একটা বেডিং নিতে হবে আর একটা সুটকেশ···হ্যাঁ ভাল কথা, আজ আমাদের কমাণ্ডাণ্ট বলছিলেন, আপনাকে নিয়ে নাকি অফিসার মহল সরগরম। যাতায়াতের পথে হয়ত দেখেছে আপনাকে। কাজেই খুব সাবধান। আমার অনুপস্থিতিতে অতি উৎসাহী কোন সিভ্যালরাস অফিসার আপনাকে আবার কোর্ট না করে বসে।'

'ষ্টপ···ষ্টপ প্লিজ, ছিঃ ছিঃ আপনি এমন অভদ্র হয়ে উঠলেন কেন আজ ? নেশা টেশা করে এসেছেন নাকি ? মিলিটারী অফিসারদের তো গুণের ঘাট নেই।'

বিকাশ হেসে বলল, 'নেশা করিনি, নেশা ভাঙছি।' ওর বক্তব্য বুঝল না অনুসূয়া।

চায়ের পালা শেষ হতেই বিকাশ, বলল, কিছু টুকিটাকি জিনিষ কিনতে সে সহরে যাবে।

‘কি আশ্চর্য, আপনি আমার মনের খবর পেলেন কি করে?’—অনুসূয়া সহাস্যে প্রশ্ন করল।

‘কি রকম?’—বিকাশেরই বিস্ময় লাগে।

‘আমিও ভাবছিলাম আজ বেড়াতে বেরুবো আপনার সঙ্গে। এতদিন এসেছি অথচ জায়গাটা কিছুই দেখলাম না। জীবনে আর কখনও হয়ত আসতে হবে না এখানে, কাজেই শেষ দেখাটা দেখেই যাই।’

‘তাই বুঝি সাজ-গোজ করে বসেছিলেন?’

‘ঠিক ধরেছেন।’

বিকাশ গম্ভীর হয়ে উঠল। ওকে নিয়ে ইতিমধ্যেই যদি অফিসার মহলে গাল গল্প হয়ে থাকে তা হলে আজ রাস্তায় বেরুবার পর কাল অসংখ্য কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে তার জান যাবে। কিন্তু না-ই বা বলবে সে কোন যুক্তিতে?

কাজেই অনুসূয়াকে নিয়েই বেরুলো। বেশ একটু লজ্জা লাগছিল মনে মনে কিন্তু উপায় কি?

বেড়াতে বেরিয়ে যেন খুশীতে উপচে পড়ছে অনুসূয়া। শিশুর মত অসংখ্য কৌতূহল তার: ফুলের দোকান আছে এখানে? নেই? কি আশ্চর্য! বিশ্রী জায়গাতো।

‘ফুল দিয়ে আপনি কি করবেন? ফুল তো আমাদের বাঙলোতেই আছে।’

'তাতো আছেই, বাজারে তো নেই। আপনাদের কলকাতার মার্কেটে বেলফুলের কুরুবক বিক্রী হয়? হয়না? আমাদের মহারাষ্ট্রে মেয়েরা ফুল পেলে সোণার গয়নাও পরে না।'

'পুরুষের মত মালকোচা দেয়।'—বিকাশ ঠাট্টা করে।

'সে অনেক আগে, এখন নয় মশায়। যান দেখে আসুন গিয়ে পুনায়।'

'দেখেছি, পুনায় ছিলাম আমি।'

'আচ্ছা এখানে রাস্তায় মেয়ে নেই কেন?'

'মেয়েরা বাড়ীর বার হয় না বলে।'

'কেন বলুন তো?'

'ভারতের সমস্ত প্রদেশ একই গতিতে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়নি তো। এটা হচ্ছে পশ্চাদপদ জায়গা।'

'তাই বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ফেরার পথে এক ঠোঙ্গা চানাচুর কিনে কুড়মুড় করে চিবুতে লাগল অনুসূয়া, বলল, 'এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কতদিন বাদে বেরুলাম। চলুন আরও একটু বেড়িয়ে বেড়াই। সত্যি এত ভাল লাগছে আমার।'

তার আবদারের সুর বিকাশের মনে খুশীর আমেজ বুলিয়ে দিল। আবছা আলোয় সুবিন্যস্ত অনুসূয়াকে রোমান্টিক অভিসারিকার মত লাগল।

শীতের সন্ধ্যা। ক্যাণ্টনমেণ্টের পীচ ঢালা পরিচ্ছন্ন বড় বড় সড়ক নিস্তব্ধ নির্জন। মাঝে মাঝে মিলিটারী মোটর চলে যায় উল্কা বেগে। বৃটিশ লাইনের আশে পাশে এদিকে ওদিকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে নজরে পড়ে তুই একটা। শিকারের আশায় ওত পেতে আছে। রাস্তার মাঝে মাঝে হাতে লাল ফিতে আটা মিলিটারী পুলিস। এ রাস্তায় দিনের বেলায় অফিসারের পক্ষে হাঁটা বিড়ম্বনা। সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হলেই পা ঠুকে স্যালিউট করে। তার উত্তর দিতে দিতে দম ফুরিয়ে যায়। তবে সন্ধ্যায় ওসব ঝামেলা নেই।

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল তারা তুজন। নির্জন রেলওয়ে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে গাড়ীর আসা যাওয়া দেখল বহুক্ষণ।

'আচ্ছা এ গাড়ীটা কোথায় যাবে?'—প্রশ্ন করে অনুসূয়া।

'আপনার শ্বশুরবাড়ী।'

'আপনার শ্বশুরবাড়ী যায় না?'

'যায় বই কি, সকলের শ্বশুরবাড়ীতেই যায়। কিন্তু এই শীতে ওভারকোট না এনে বেড়াতে এসে আপনি কি অন্য কোথাও যেতে চান তাড়াতাড়ি?'

'ভুলে গেছি···' কাঁদো কাঁদো ভাবে জবাব দেয় অনুসূয়া। অনেক আগেই তার শীত ধরে গেছে। এবার বুঝল শীতের কারণটা। কাতর নয়নে তাকালো বিকাশের দিকে।

'মেয়েদের মাথায় ধূসর বর্ণের পদার্থ একটুও নেই বোধ হয়। এদিকে আসুন।'

'না না আমার একটুও শীত করছে না।'

'দাঁতে দাঁত ঠেকে যাচ্ছে আর বলছেন শীত করছে না।'

বিকাশ নিজের ওভারকোটটা খুলে ওর দিকে এগিয়ে দিল। বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল, 'হাত দুটো তো ঠাণ্ডায় জমে গেছে। কোটের পকেটে আমার দস্তানা আছে, পরে নিন আর কান দুটো ঢাকুন রুমাল বেঁধে।'

কোটের পকেট থেকে রুমালটা বার করে সে নিজেই ওর কান দুটো ঢেকে দিল। অনুসূয়া যেন নিজেকে একদম ছেড়ে দিয়েছে বিকাশের হাতে। চারিদিকে কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। ঝিঝির একটানা সুর-ঝঙ্কারে বাতাসে অপূর্ব্ব মায়াপরশ। আধোআলো আধোছায়াময় রেলওয়ে ব্রিজের উপর দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রইল তারা। কারো মুখে কোন কথা নেই কিন্তু মন ভরে আছে অসংখ্য কথার ভিড়ে। কোথায় যেন সঙ্কোচের যবনিকা তাদের মাঝখানে ব্যবধান তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ বিকাশ ডাকল চুপি চুপি, অনুসূয়া।

'ইয়েস'।—ভাবাবেশে গম্ভীর মুখ তার কুয়াসা ভেদ করা চাঁদের আলোর অলৌকিক ইশারায় রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ নয়নে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল বিকাশ।

'ভারী ভাল লাগছে।'

'আমারও।'

'কোথাও আমাদের দুজনের মনের মিল আছে নিশ্চয়ই।'

'সে কথা অনেক দিন আগেই আমি অনুভব করেছি।'

'সত্যি ?'—বিকাশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

'সত্যি। আমি ভালবাসি এই প্রকৃতির বৈচিত্র্য।'

'আর কি ভালবাসেন জানতে ইচ্ছে করে। দুজনের জীবন পরিকল্পনায় যদি মিল থাকে কোথাও, তাহলে বোঝা যাবে দুজনের মনের মিল আছে নিশ্চয়ই।'

'আমার কোন জীবন পরিকল্পনাই নেই। খুবই মামুলী, সাধারণ আমার আশা আকাঙ্ক্ষা। শুনলে আপনার হাসি পাবে।'—অনুসূয়া সলজ্জভাবে বলল।

'হাসব না' কারণ আমারটাও খুব সাধারণ আর সহজ। আর কথাটা কি জানেন, সব মানুষই জীবনটাকে সহজ সরল করতে চায় কিন্তু সরল লক্ষ্যে পৌঁছোবার পথটা বড় জটিল, তাই অধিকাংশই সেই জটিলতার বেড়াজালে আটকে পড়ে।'

'শুনে নিশ্চয়ই ঠাট্টা করবেন, আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি।'

'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করব না। মানুষের অজ্ঞতা ব্যাঙ্গের জিনিষ নয়।'

'জানেন, খোসলার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি কোন বিবাহিত জীবনের কথাই ভাবিনি। ছেলেবেলা

থেকে বাবার উপেক্ষায় শুধু এই সঙ্কল্পে অটল ছিলাম যে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। খোসলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর আমার আর চাকরী করতে ইচ্ছে করেনি একদিনের জন্যও। সংসারের কর্ত্রীত্বের প্রতি আমার লোভ প্রচণ্ড। উদার সহানুভূতিশীল স্বামী আর দুরন্ত ছেলে মেয়ের ছোট্ট একটা সংসার—এর বেশী কিছু আমার চাইবার নেই। সহরে অথবা সহরতলীতেই থাকুক আমাদের একটা নিজস্ব বাসা,—মনের মত করে সাজাবো। মাঝে মাঝে যাবো বেড়াতে সমুদ্রের ধারে কিম্বা পাহাড়ের চূড়ায়, গান গাইব, হাসব খেলব······সত্যি আজকের সন্ধ্যায় প্রকৃতির এই নিবীড় মৌনে একটা অসীম রহস্যের আভাস নেই কি? কতো পবিত্র, কতো স্বর্গীয়—মনের দ্বার আপনিই উন্মুক্ত হয়ে যায়। আচ্ছা আপনার কথাটা তো কিছু বললেন না।'

'আগেই বলে রাখি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই।'

'জানি। তা'ত বলেছেন।'

'যুদ্ধের শেষে আমি চলে যাব বাঙলাদেশের কোন মফঃস্বল সহরে। সেখানে গরীবদের মধ্যে সস্তায় চিকিৎসা করব, বাস করব সাধারণ মানুষের মধ্যে। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা ছিল আমার সারা জীবনের সখ। অবস্থা ভাল নয়, তাই উপার্জনের তাগিদে ওসব ছাড়তে হয়েছে। যতটুকু পারি সেটা পুষিয়ে নেব মানুষের সেবা করে। পারিবারিক জীবন

সম্বন্ধে আপনার আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার একটুও অমিল নেই। মোটামুটি আর্থিক সচ্ছলতা, শান্তিপূর্ণ সংস্কৃত জীবন--এইটুকু পেলেই সুখী হব।'

কয়েক মুহূর্ত তারা নির্বাক বসে রইল। তারপর কথা বলল অনুসূয়া—একটা কথা জানতে হচ্ছে করে······অবশ্য খুবই ব্যক্তিগত······।'

'কি বলুন তো ?'

'আপনার কোন······প্রেম······'

বিকাশ হেসে উঠল। ঠাট্টার সুরে বলল, 'না। খোসলার মত ভাগ্যবান নই।'

ব্রিজের নীচে দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ কবে চলে গেল একটা মালগাড়ি।

'চলুন এবাব ওঠা যাক।'—বলল বিকাশ, কারণ ইতিমধ্যেই তার শীত ধরে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় একটা টোঙ্গা পাওয়া গেল ব্রিজের নীচে। দুজনেই তারা উঠে বসল।

'বেশ বেড়ানো হল আপনার সঙ্গে।'

'শেষ বেড়ানো হল আমার সঙ্গে।'

'হয়ত তাই, তবুও সারা জীবন মনে থাকবে।'

'না থাকলেও ক্ষতি নেই।'—সিনিকের মত শোনালো বিকাশের কণ্ঠস্বর।

'তা জানি। আপনার কাছে খুবই তুচ্ছ আমি। তাই আমার মনে থাকা না থাকায় কিছুই যে আপনার এসে

যায় না তাও বুঝি।'—অভিমানে তার গলা ভারী হয়ে উঠেছে।

বিকাশ বলল, 'আমার কথার উল্টো মানে করবেন না। আপনি বলছেন, আজকের সন্ধ্যাটা আপনার সারা জীবন মনে থাকবে কিন্তু বিপদ হয়েছে আপনাকে বাড়িতে স্থান দিয়ে। দুদিন বাদে আপনি চলে যাবেন, তখন আমার পক্ষে এখানে একলা থাকা যে কি কঠিন হবে তা বুঝতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক মাত্র কদিনের, কিন্তু আপনাকে বাদ দিয়ে এখানকার জীবনের কথা ভাবতে গেলে এখন আমার ভয় লাগে।'

অনুসূয়ার চেতনা অবশ হয়ে আসছিল। সে অনুভব করল তার বাঁ হাতখানা বিকাশের কোলের উপর তারই হাতের মুঠিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। আলগা হাতমোজাটা কি তাহলে রাস্তায় পড়ে গেছে কোথাও? বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যে ভাষায় বিকাশ কথা বলছে, সেটা ওর স্বাভাবিক ভাষা নয়। এ যেন কিছুটা করুণ বিলাপের মত। সমস্ত শক্তি দিয়েও হাতখানা সে ওর মুঠি থেকে ছাড়াতে পারল না। হাতে যেন কোন জোর নেই, জোর নেই দেহে, মনেও।

'আপনার ছেলেমানুষীর একটা অদ্ভুত চার্ম আছে। আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলো ভরে উঠেছে।'

অনুসূয়া জবাব দিল না। জবাব দিতে তার ভয় করছিল। সে বলতে পারত, আপনাকেও আমার খুব ভাল লাগে, ভাল লাগে আপনার গম্ভীর ঔদার্য, সস্নেহ ব্যবহার, গভীর সহানুভূতি। কিন্তু তাতে অপর পক্ষ কি ভেবে কি করে বসবে, সেই আশঙ্কায় চুপ করে রইল। এক সময় তার মনে হল বিকাশ মুঠি খুলে ছেড়ে দিয়েছে তার হাতটা। ঠিক তখনই এসে টোঙ্গা থামল তাদের দরজায়।

বাসায় পৌঁছে সটান গিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল বিকাশ। শরীরটা সত্যিই দুপুর থেকে ঢিলেঢালা লাগছিল। কাপড় বদলে অনুসূয়া ঢুকল এসে সেই কামরায়। বিকাশ সেন্টের মৃদু গন্ধে আর কাপড়ের খসখসানি শুনে চোখ বুজেই বুঝতে পারল অনুসূয়া উপস্থিত। চোখ মেলে দেখল তার পাশে তারই মুখের উপর উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনুসূয়া। ওর ঠাণ্ডা নরম হাতের স্পর্শ পেল নিজের উষ্ণ কপালে। বিকাশ বলল, 'যা বলেছি সব তৈরী রাখবেন কাল দুপুরের মধ্যে। সন্ধ্যায় এসেই মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

'কিন্তু আপনার যে শরীর খারাপ।'

'সামান্য একটু। কাল সকালেই সেরে যাবে। খোসলার ফোটো আছে তো আপনার কাছে?'

অনুসূয়া মাথা নেড়ে জানালো আছে।

'সেটা দেবেন কাল, মিলিয়ে দেখতে হবে ডিপোর ফোটোর সঙ্গে।'

'কিন্তু তাতে যে আমার ফোটোও আছে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। আপনি আবার ফেরৎ পাবেন।'

কিছুক্ষণ বাদে বিকাশ বলল, 'আপনি খোসলার বাগদত্তা, তার ভাবী শিশুর জননী। ভারী আশ্চর্য, সে আপনাকে ভুলে আছে।'

অনুসূয়া ধরা গলায় বলল, 'এমনও তো হতে পারে সে হয়ত আর.........'

'হতে পারে অনেক কিছুই। যদি মরেও গিয়ে থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পথে আপনাকে অন্ততঃ পঞ্চাশ খানা চিঠি সে লিখতে পারত। লেখেনি বলেই সন্দেহ হয়।'

অনুসূয়া বলল, 'গত দু'মাস আমি সমস্ত ব্যাপারটা নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেছি। সব চেয়ে খারাপ সম্ভাবনার কথা ভাবতে আমার ভয় লাগে, কিন্তু তবুও অপ্রত্যাশিত হবে না কিছুই আমার কাছে। মনকে সেই ভাবে তৈরীর চেষ্টা করছি।'

'কি করবেন তাহলে?'

'কিছুই স্থির নেই। তবে মাথা নীচু করে আমি কিছুতেই ফিরতে পারব না বাপ মা বন্ধুবান্ধবের কাছে। যেমন সদম্ভে ত্যাগ করেছি তাদের, তেমনি সগৌরবে যদি তাদের কাছে ফিরে যাবার মত অবস্থা না হয় তাহলে উত্তর

ভারতের কোথাও একটা চাকরী বাকরী নিয়ে সেখানেই বাস করব সকলের অজ্ঞাতে। মা হয়ে নিজের শিশুকে কারও চোখে ছোট করতে পারব না।'

'আশা করি এসব কিছুই করতে হবে না আপনাকে। পরশুই যেন আমি খুঁজে বার করতে পারি আপনার খোসলা ক্যাপ্টেনকে।'

সেই রাত্রে তারা নীরবে আহার শেষ কবে যে যার নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিকাশ ভাবছিল অনুসূয়ার কথা। মেয়েটি খুবই সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। ওর সংকল্পের দৃঢ়তা প্রেরণাদায়ক, কিন্তু বিকাশের ভয় হয়, সঙ্কটের চরম মুহূর্তে বে-পরোয়া হয়ে ও হয়ত এমন কিছু করে বসতে পারে যাতে ওর জীবনটাই বরবাদ হবে। ভাবপ্রবণ মানুষদের সম্বন্ধে এ এক মস্ত বিপদ। বিকাশ ভাবে, মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার ভালবাসা। সেই ভালবাসার দাবীতে ও সর্বস্ব পণ করেছে। ওকে শ্রদ্ধা করে বিকাশ। ওকে সে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে যাতে সব সমস্যাব সহজ সমাধান হয়।

পাশের কামরায় অনুসূয়া নিদ্রাহীন, নিজের ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন। যা ছিল অস্পষ্ট আভাস তা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠছে মনের পটভূমিকায়। খোসলার নীববতা আকস্মিক বলে ভাববার সূত্র যেন হারিয়ে গেছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব,

যারা আভাসে ইঙ্গিতে এমন সন্দেহের কথা প্রকাশ করে তাকে সতর্ক করেছিল, তাদের সবটুকুই যে গোঁড়ামিপ্রসূত এমন কথা মানতে তার আজ হঠাৎ খট্‌কা লাগে। সামরিক সাজ-পোষাক পরা লোকদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের একটা ভয় মিশ্রিত ঘৃণা আছে। না থাকবেই বা কেন ? অনুসূয়া জানে সেকেন্দ্রাবাদের মত চমৎকার সহরটিকে সৈনিকরা কি ভাবে নরকে পরিণত করেছে। শেষ দিকে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করাই মুস্কিল হয়ে উঠেছিল। কত মেয়ের যে ওরা সর্বনাশ করেছে, কত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মুখে যে ওরা কালি লেপে দিয়েছে, তার হিসাব লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সেকেন্দ্রাবাদের আবহাওয়াটা এমনি অসুস্থ হয়ে উঠেছে যে বহু পরিবার দেশত্যাগ করে চলে গেছে। স্কুল কলেজ চলছে ধিকি ধিকি করে। নিতান্তই সেকেন্দ্রাবাদের সঙ্গে নিজামের নিজের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত বলে সরকারী অর্থানুকুল্যে শিক্ষার্থীর অভাবেও চালানো হচ্ছে স্কুল কলেজগুলো। জোর, জুলুম, জবরদস্তি, মারপিট, খুন জখম—এ সব তো প্রাত্যহিক ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে। খাঁকী-ধারীদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এই ঘৃণা থেকেই যারা খোসলাকে সাদা চোখে দেখতে পারেনি, তাদেরও দোষ দিতে পারে না সে। অনুসূয়া হঠাৎ তাদের যুক্তির সারবত্তা বোঝবার চেষ্টা করে। তাদের অনুমানের সূত্র ধরে এগোতে গেলে যেখানে পৌঁছোতে হয়, সেখানে তার সামনে

দিগন্ত বিস্তৃত ঘন কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। লেপের মধ্যেই তার সারা দেহ শিউরে ওঠে। খোসলা যদি অস্বীকার করে তাকে ? খোসলা যদি স্বীকার না করে তার পেটের সন্তানকে ? যদি উপহাস করে তাড়িয়ে দেয়, মিথ্যা বলে ব্যঙ্গ করে ? ...না না কিছুতেই তা হতে পারে না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে খোসলা তাকে ভালবাসেনি, ভালবাসার অভিনয় করেছিল, তবুও খোসলার সেই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে তার মন নিশ্চয়ই বদলে যাবে। তার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করতে পারে, কিন্তু নিজের সন্তানের মাকে সে নিশ্চয়ই ভালবাসবে। তার সন্তান,—সে তো খোসলারই বংশধর। যে শিশু তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা মাথায় নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে, তারই পদবী নিয়ে বিশ্বের দরবারে পরিচিত হবে, সে শিশুর জন্মদাত্রীকে অস্বীকার করা সম্ভব হবেনা খোসলার পক্ষে। তা ছাড়া মা হয়ে যে অনাগত শিশুর জন্য তার বুকে এত স্নেহ মমতা জমে উঠেছে, সে শিশুর পিতার বুকটা যখন পাথর দিয়ে তৈরী নয়, তখন সেখানেও কিছু করুণা আশা করা অন্যায় নয়।

কিন্তু কেন ? সেকি খোসলার অনুগ্রহভিখারী ? খোসলা যদি লম্পট মিথ্যাবাদী হয়, তাকে অস্বীকার করে, তাহলে সেও ছাড়বে না, দুটি থাপ্পড় সে কসিয়ে দেবে তার গালে। তারপর বুক ফুলিয়ে চলে আসবে তার কাছ থেকে। স্বতন্ত্রভাবে

বিধবার মত বাস করবে সে উত্তর ভাবতের কোন সহরে। ছেলেকে গড়ে পিটে আগুনের শিখা তৈরী করবে। বিরাট রকমের কিছু একটা হয়ে উঠবে ছেলেটা, ভারতজোড়া সুখ্যাতি হবে তার এবং তার খ্যাতির শিখরে অনুসূয়া নিজের সমস্ত কাহিনী প্রকাশ করবে তার আত্মজীবনী লিখে। সেদিন লোকে থুথু দেবে খোসলার গায়ে।

পাঞ্জাব রেজিমেণ্টে প্রহরের ঘণ্টা পড়ল। অনুসূয়ার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ঘুম আসবে না সহজে। হঠাৎ তার মনে পড়ল সন্ধ্যার কথা। বিকাশের দিকে ধীরে ধীরে সে এত বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে যে, নতুন জটিলতা সৃষ্টি হবার আগেই দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। ক'দিন ধরেই নানা ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে সে অনুভব করছে বিকাশ তার অজ্ঞাতেই তার বুকের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। হৃদয়ের সান্নিধ্য গভীরতর ব্যাপ্তিতে প্রভাবিত করছে তাকে। বিকাশ তাব সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করছে ধীরে ধীরে। তাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। ওর দুটি বাহুর দাবী অস্বীকার করার শক্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হবে দেহ থেকে, মন থেকে।

পাশ ফিরে শুতে গিয়ে হঠাৎ তার বুকের মধ্যে খচ্ করে একটা ব্যাথা ধরে যায়, দমবন্ধ হয়ে আসতে থাকে। অনুসূয়ার মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে ওঠে, বাচ্চাটা কি দুষ্টুই না হচ্ছে! ওতো আর জানে না, ওর মা কি বিপর্যয়ে

পড়েছে। অনুসূয়া ভুলে যায়, ছেলে হতে এখনও ওর অনেক দেরী। দেহের মধ্যে যা কিছু সজীব, তাই অনাগত শিশু নয়। তবু সন্তানের কল্পনায় কেমন একটা সান্ত্বনা পায় অনুসূয়া। আস্তে আস্তে ঘুমে ঢুলে পড়ে শেষরাতে।

একা একা দিন কাটে। বিকাশ গেছে লক্ষ্ণৌ, সোয়েটার বোনাব কাজটাও শেষ, আর বই যে ক'খানা ছিল খুঁটিনাটি পড়া হয়েছে অসংখ্য বার। সকালে চা সেরে লছমনিয়াকে সামনে দাঁড় করিয়ে পিয়ানোয় বিখ্যাত বিখ্যাত গৎ শোনায় অনুসূয়া। কতবড় যেন সমজদার পেয়েছে।

'কেমন লাগছে লছমনি ?'

'বহৎ আচ্ছা মেমসাহাব, তবলা কে লিয়ে ছোটেলালকো বোলাউঁ ?'

'না, না, ছোটেলালকে নয়। তবলার সঙ্গে বাজাতে পারব না।'

দুপুর বেলায় হঠাৎ সে সাজাতে বসে লছমনিয়াকে। চুল বেঁধে, শাড়ী দিয়ে, গহনা দিয়ে, প্রসাধন দিয়ে অপরূপ করে তোলে তাকে।

'এবার যাও ছোটেলালের কাছে। দিওয়ানা হয়ে যাবে, বুঝলে ?'—হাসতে হাসতে ওকে পাঠিয়ে দেয় রান্নাঘরে।

উনুনে কয়লা চাপাচ্ছে ছোটেলাল। উগ্র প্রসাধনের গন্ধ আর কাপড়ের খসখস আওয়াজ শুনে পিছু ফিরে বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিজের স্ত্রীর দিকে।

লছমনিয়া কথা বলে না। ভ্রূ নাচিয়ে মুখ টিপে হাসে। তার ভ্রূর তালে তালে ছোটেলালের হৃদয় দোল খায়। বিশ বছর একসঙ্গে ঘর করে যে মেয়ের সব কিছু জানা আছে বলে তার ধারণা ছিল, সে মেয়ে হঠাৎ অপার রহস্যময়ী অজ্ঞাত আভাসে রূপান্তরিত হয়েছে। এ কি বিস্ময়!

কালিমাখা দুটি হাত বাড়িয়ে বলে, 'আও।'

দুহাত পিছু হ'টে চোখ-মুখের ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে লছমনিয়া জানায়, 'নেহি।'

ছোটেলাল পারে না আর নিজেকে ধরে রাখতে। এই মুহূর্তে লছমনিয়াকে স্পর্শ করতে না পারলে সারা জীবনই যেন ও স্পর্শের অতীত থেকে যাবে। ছুটে যায় ছোটেলাল, কিন্তু ততক্ষণে লছমনিয়া বাঙলোর প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে।

'আও'।—দূর থেকে অস্ফুটে মিনতি জানায় ছোটেলাল।

লছমনিয়া সহাস্যে মাথা নাড়ে, যাবে না।

কাঁচের জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে অনুসূয়া হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে।

রাত্রে লছমনিয়া আর অনুসূয়া শোয় পাশাপাশি খাটিয়ায়। ভূতের গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায় অনুসূয়া।

লছমনিয়া প্রশ্ন করে, 'সাহেব আপনার কি হন, মেমসাহেব ?'

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে ওঠে, মাথা ঝিমঝিম করে তার। এমন অবান্তর প্রশ্ন করে কেন তাকে লছমনিয়া ? অনুসূয়ার রাগ ধরে যায়।

'সাহেব খুব ভাল লোক, না মেমসাহেব ? আপনার মন কেমন করে না সাহেবের জন্য ?'

এই প্রশ্নে সত্যিই তার মন কেমন করে ওঠে বিকাশের জন্য। এই শীতের রাত্রে কোথায় কোন হোটেলে কত অসুবিধার মধ্যেই না জানি তাকে দিন কাটাতে হচ্ছে। অজ্ঞাত, অপরিচিত একটি মেয়ের জন্য লোকটার ছুটোছুটি হাঁটাহাঁটির অন্ত নেই। খোসলার উপর তার রাগ হয়, ঘৃণা হয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী হয় তার নিজের উপর।

'সাহেব কবে ফিরে আসবেন, মেমসাহেব ?'

অনুসূয়া বলে, 'ঘুম আসছে লছমনি।' কিন্তু ঘুম আগে নামে লছমনিয়ার চোখে। ওদিকে প্রহরের পর প্রহর কাটে অনুসূয়ার জ্ঞাতসারেই। নিজের উপর রাগতে রাগতে এক সময় তার মনে হয়, যত নষ্টের গোড়া তার পেটের সন্তান। ও যদি না আসত তাহলে তাকে এমন উদ্‌ভ্রান্তের মত ছটফট করে বেড়াতে হত না। খোসলার সমস্ত ব্যাপারটা নতুন করে বিবেচনা করতে পারত ধীর মস্তিষ্কে, কিন্তু এখন যে আর উপায় নেই। নতুন শিশু খোসলার

সঙ্গে তার জীবনকে এমন অবিচ্ছেছ্য বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে যে সে বাঁধন শিথিল হলে তার জীবনের গ্রন্থিও আলগা হয়ে যাবে।

ভোর হয়। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। চাঁদের সোনালী স্বপ্ন পাখা মেলে কুয়াশার ধূসর আস্তরণে। উন্মনা দুপুরে ব্যাকুল মন তার উদাসী হয়ে ওঠে। কার প্রতীক্ষায় সময়ের প্রবাহ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে অনুসূয়া? দিনান্তে নিশান্তে কার আগমন সম্ভাবনায় হৃদয় তার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে? একি তার অন্যায়? অনুচিত? অসংযম? তার এ শিশু কি শুধুই অসংযমের কলঙ্কময় অবদান? এই সৃষ্টির পেছনে কি কোন কল্যাণ নেই, সহিষ্ণুতা নেই, একাগ্র তপঃপরায়ণতা নেই, চরিত্রের পবিত্রতা নেই, সতীত্ব নেই? ভালবেসে আত্মদান করার মধ্যে কি কোন মহত্বই নেই? অসম্ভব, অসম্ভব। মনকে প্রবোধ দেয় অনুসূয়া। যদি মাথার উপরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে, যদি সকালে সূর্য আর রাত্রে চাঁদ ওঠে, নদীতে জোয়ায় ভাঁটা খেলে, নরনারীর ভালবাসা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহলে নতুন শিশুর জননীত্বও তাকে মহিয়ষী করেছে। মানুষের জন্ম মৃত্যু জীবন-ধারণ, সে তো ঈশ্বরেরই লীলা। এই অসীম বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়ে চলছে তাঁর নিত্য নূতন খেলা। সবার উপর সত্য সেই অতি জাগতিক সত্তা প্রতিটি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। তিনি মঙ্গলময় কল্যাণময় করুণাময়,

তাঁর অমোঘ বিধান সুন্দরের পথে সামঞ্জস্যের পথে কল্যাণের পথেই পরিচালিত। দেওয়ালের টিকটিকিটা একটা মাছিকে ছোবল মেরে গিলে ফেলে। হঠাৎ চমকে উঠে অনুসূয়া, গা শির শির করে তার, তাড়াতাড়ি বাইরে বাগানের দিকে চোখ ফেরায়। যা সত্য তাই যদি সুন্দর হয়, তাহলে খোসলার প্রতি তার ভালবাসাও নিশ্চয়ই সুন্দর। সে ভাল-বাসায় আন্তরিকতা আছে, আবেগ আছে, স্বতস্ফূর্ততা আছে। সুন্দর কখনও অসুন্দরের সৃষ্টি করে না, সুতরাং তার নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসালব্ধ মাতৃত্বও সুন্দর, সুন্দর তার শিশু।

তৃপ্তি পায় অনুসূয়া। যুক্তি দিয়ে যতবার সে নিজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে যায় ততবারই তার মনে হয়, সে কোথাও কোন ভুল করেনি, এবং তার পরেই তার মনে হয় শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে। শকুন্তলার জীবনেও তো এমনি বিভ্রান্তি আর বিপর্যয় জমে উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই তো সে ফিরে পেল, তবুও তো সেখানে দুষ্মন্ত তাকে সরাসরি অস্বীকার করেছিল। তার জীবনে এখনও পর্যন্ত তেমন পরিস্থিতি আসেনি। মিলিটারীর উল্টো পাল্টা কাজের মধ্যে পড়ে লোকটা হয়ত এমন অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে যে যোগাযোগ করতে পারছে না তার সঙ্গে। কে জানে, হয়ত এতদিনে চিঠি এসে গেছে সেকেন্দ্রাবাদের ঠিকানায়। হয়ত সে দুঃখ করে, ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছে। খোসলার সম্ভাব্য চিঠির কথা ভেবে তার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

তার সঙ্গে একত্রে কাটিয়েছে অনেক দিন কিন্তু চিঠি লেখা-লেখি হয় নি কখনও। কেমন জানি লেখে সে, কি বলে সম্বোধন করেছে? কি লিখেছে, কি লিখে শেষ করেছে?—কল্পনা করতে করতে ঝিম ধরে যায় অনুসূয়ার।

লছমনিয়ার আহ্বানে ফিরে তাকিয়ে দেখল সত্যিই চিঠি এসেছে খামে মোড়া, তারই নামে। বুকের কাঁপুনি নিয়ে খাম খুলে আগেই সে স্বাক্ষরকারীর নাম দেখল—বিকাশ মজুমদার। ইংরাজীতে পরিষ্কার করে লেখা পাঁচ লাইন। শরীর তার অসুস্থ। লক্ষ্ণৌ থেকে আম্বালায় ফিরছে। ছোটেলাল যেন ষ্টেশনে থাকে। ব্যাস্, আর কোনো কথা নেই। একবার দুবার করে বহুবার পড়ল অনুসূয়া, চিঠির কোথাও খোসলার নাম উচ্চারিত হয় নি।

'সাহেব লিখা, ক্যা?'

'হাঁ লছমনি, ছোটেলালকে বলে দিয়ো রাত্রে লাহোর এক্সপ্রেসে সাহেব আসবেন। উনি অসুস্থ। ষ্টেশনে হাজির থাকতে বলেছেন।'

লছমনিয়া চলে গেল। অনুসূয়া ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। একটু আগে তার মনে যে তৃপ্তি আর সান্ত্বনার ঢেউ উঠেছিল, মিলিয়ে গেল মুহূর্তেই। বিকেলে সে ঘরের বার হল না, সাজ পোষাক বদলালো না। চুপটি করে চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দিল।

সন্ধ্যা ঘুরে রাত হয়েছে। ঘরে আলো জ্বেলে চুল্লীতে আগুন দিয়ে গেছে ছোটেলাল। অন্যমনস্কভাবে সবই লক্ষ্য করেছে অনুসূয়া। তবুও তার যেন কোন তাগিদ নেই ওঠবার।

চায়ের পেয়ালা হাতে লছমনিয়ার আবির্ভাবে সে যেন স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

'মেমসাহেব, আপনি আজ এমন উদাস হয়ে গেলেন কেন? সাহেবের জন্য মন কেমন করছে বুঝি?' তার সঙ্গে মিশে মিশে বেশ একটু চালাক আর সাহসী হয়ে উঠেছে লছমনিয়া।

'দূর পাগলী। এমনিই বসে আছি। শীতে উঠতে ইচ্ছে করছে না।'

'সাহেব এসে পড়বেন এক্ষুণি। কাপড় টাপড় বদলে নিন। ছোটেলাল তো ষ্টেশনে যাবে বলে এখনই মালকোঁচা আঁটছে।'

অনুসূয়া লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। এরা দুজনে মিলে তাকে যা ভেবেছে, তা সে বুঝতে পারে। আর সে কথা যত বেশী করে অনুভব করে ততই লজ্জায় তার মন শির শির করতে থাকে। ওরা ভাবে সাহেব ওর একান্ত প্রিয়জন। তারই প্রতীক্ষায় ও দিনরাত প্রহর গুনছে। সেজে গুজে সাহেবের মন ভুলিয়ে খুশী রাখা তার কর্তব্য। কিন্তু ধারণাটা এমন সোজাসুজি করে ফেলল কি করে? আচারে ব্যবহারে

তারা তো যতদূর সম্ভব দূরত্ব রেখে চলে। অন্তত এমন ধারণার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বিশেষ করে তার এখানে আসা থেকে গত তিন সপ্তাহ পর্যন্ত থাকার ইতিহাসটা খুঁটিনাটি সবই ওরা জানে। তবুও এমন ধারণা কেন করে?

'আজ সেই নীল সাড়ীটা পরুন, আর খোঁপায় ফুল লাগান। এই যে আমি এনেছি।'

কোঁচড় থেকে একটা ফুলের মালা বার করল লছমনিয়া।

অনুসূয়া উঠল, কাপড় বদলালো এবং লছমনিয়ার দেওয়া ফুলের মালাটা খোঁপায় জড়িয়ে নিল।

'সাহেব খুব খুশী হবেন।'—লছমনিয়া দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে ছুটে পালালো।

অনুসূয়া যন্ত্রের মতো এসে দাঁড়ালো আয়নার সামনে। বিকাশ খুশী হবে? সত্যিই হবে নাকি? নিজেকেই প্রশ্ন করে অনুসূয়া। বিকাশ কি তাকে দেখে খুশী হয়? কই, কোন দিন তো তেমন আভাস দেয়নি সে। প্রসাধনের ছোট-খাট ত্রুটিগুলো সেরে নিল অনুসূয়া। উল্টো দিকের দেওয়ালে টাঙানো সামরিক পোষাক পরা বিকাশের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে আয়নায়। স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকালো অনুসূয়া। আশ্চর্য, বিকাশের মুখের চেহারায় শিশুর সরলতা আছে অথচ কাছাকাছি থাকলে কত ভারিক্কি মনে হয় তাকে। বাঙলা দেশের ছেলে—মার্জিত কিন্তু আত্মম্ভরি।

গাম্ভীর্যের আবরণে ঢেকে রেখেছে নিজের স্বরূপ। প্রতিমুহূর্তে নিজের সম্বন্ধে সচেতন।

ছোটেলাল এসে বলল,—'মেমসাহেব ষ্টেশনে যাচ্ছি।'

'ঘুরে এসো।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুসূয়া। সেকেণ্ডের কাঁটার উদ্দাম গতির সঙ্গে এগিয়ে চলেছে সময়—অবাধ, নিরবচ্ছিন্ন। বুকের মধ্যে গুরু গুরু সুরু হয়েছে। থরো থরো হৃদয় প্রত্যাশায় ব্যাকুল। দুই হাত বুকে চেপে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে থাকে। হৃদয়ের স্পন্দন হাতের অনুভূতির মধ্য দিয়ে সারা দেহে সঞ্চারিত হয়ে শিহরণ জাগায়।

বাইরে জুতোর আওয়াজ। দরজার হাতল নড়ে উঠেছে। চমকে ছুটে আসে সে দরজার পাশে।

লছমনিয়া।

উন্মুক্ত দরজা ডিঙ্গিয়ে আসা ট্রেণের হুইসিলে কেঁপে ওঠে কানের পর্দা।

'ওই এলো গাড়ী সাহেবের।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, মেমসাহেব।'

ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তার। গাড়ী আসবার কথা আরও আধ ঘণ্টা আগে। নিশ্চয় লেট হয়েছে। ষ্টেশন থেকে টোঙ্গায় বাড়ী আসতে কত সময় লাগবে? আধ ঘণ্টার

বেশী নয় নিশ্চয়। তা' হলে নটার মধ্যেই এসে পড়বে বিকাশ।

কিন্তু সে আসবে অসুস্থ শরীর নিয়ে। খোসলাকেও আনবে নাকি সঙ্গে করে? আনবে না, আনবে না। খোসলা তো লক্ষ্মৌতে নেই। সে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে,—ইজিপ্টে কিংবা তেহরাণে, বুথিডং কিংবা সিরিয়ায়। কে জানে কোথায় আছে? হয়ত এই শীতের রাতে উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়ে আছে দেশান্তরে, হয়ত কোন অলক্ষিত বুলেট তার······· না না······এমন অলক্ষুনে কথা ভাবা উচিত নয়। এমন ভাবনা আসছেই বা কেন মনে? কিন্তু বিকাশ তাকে খোসলার কথা কিছু লেখেনি কেন? হয়ত চিঠি পত্রে এসব লেখা উচিত নয় বলেই লেখেনি। মিলিটারী জীবন বড় কঠিন নিয়মে বাঁধা। প্রতি পদক্ষেপে তার সহস্র নিষেধ। নিষেধ নেই শুধু মাতলামী করার, হুল্লোড় করার। তবুও এই মিলিটারীতে ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোকরাও তো রয়েছে, নইলে বিকাশের মত, খোসলার মত মানুষ মিলল কি করে?

আরও আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। বাইরে টোঙ্গার আওয়াজ কোথায়? অনুসূয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। কি ব্যাপার। এত দেরী হয় কেন আসতে? দরজা খুলে একবার সে কুয়াশা ঢাকা প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় মুখের চামড়া অবশ হয়ে উঠল। কই নেই তো কোথাও সামান্য একটু চলমান আলোর আভাস।

'কি ব্যাপার লছমনি ? ছোটেলালরা আসছে না যে ?'

'আসবে, আসবে মেমসাহেব, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?'

প্রাঙ্গণের দরজা ঠেলে সত্যিই একজন সোজা এগিয়ে আসতে লাগল। চলনেব ভঙ্গি দেখে লছমনিয়া বলল, 'ছোটেলাল'।

ছোটেলাল ঘরে ঢুকে বলল, 'সাহেবের বহুত বেমার। ষ্টেশন থেকে হাসপাতালে চলে গেছেন। আমি মালপত্র নিয়ে এলাম।'

স্তব্ধ চিত্তে এই সংবাদ শুনল অনুসূয়া। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে একটি কথাও সরল না। ছোটেলাল বলল, 'আপনাকে ঘাবড়াতে নিষেধ করেছেন। বললেন, একটু বেশী বাত্রে বাড়ী ফিরবেন।'

'কি অসুখ হয়েছে তার জানো ?'—অনুসূয়া প্রশ্ন করল।

'বললেন জ্বর মাথাধরা এই আর কি।'

'তুমি তাকে বাড়ীতে নিয়ে এলে না কেন ?'

'অনেক বললাম, কিছুতেই শুনলেন না।'

অনুসূয়া গুম হয়ে রইল। ছোটেলালের কথা থেকেই মনে হয় খুব একটা কঠিন অসুখ কিছু নয়, তবুও বাড়ীতে একবার দেখাও না দিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে যাবার পেছনে কোন্ গূঢ় রহস্য আছে ? বিশেষ করে খোসলা সম্বন্ধে একেবারে নীরব কেন বিকাশ ?

'মেমসাহেব, আপনাকে একটা প্যাকেট দিয়েছেন সাহেব। এই নিন।'

ছোটেলালের কাছ থেকে ক্ষিপ্রহস্তে মোড়কটা টেনে নিল অনুসূয়া। খবরের কাগজ জড়ানো একটা মস্ত ফাইল। ফাইলের কভার ওল্টাতেই একটা খামে আঁটা চিঠি। তাতে তারই নাম লেখা।

অনুসূয়া আলোর নীচে এগিয়ে এসে খামটা ছিড়ে ফেলল। বিকাশের লেখা।

'অসুখ আছে সামান্য তাই হাসপাতালে থেকে একটি অসুধ আনতে গেলাম। সঙ্গে ফাইলটা খোসলার সার্ভিস রেকর্ডের নকল। আগাগোড়া পড়লে সবই জানতে পারবেন। আপনার মনের বলিষ্ঠতা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা, অন্তরের নিষ্ঠা, হৃদয়ের ঐশ্বর্য সবই অতুলনীয়। মানুষের জীবনে বিপদ আপদ সঙ্কট আসে। তার কাছে মাথা নোয়ানো আপনার মত মেয়ের নিশ্চয়ই শোভা পায় না। বিপদ যত বড়ই হোক জীবন তার চেয়েও অনেক বড়। সব কিছু গ্রহণ করুন সহজ ভাবে। চারিদিকে অন্ধকার দেখবার প্রয়োজন নেই। খোসলার সার্ভিস রেকর্ডই আপনার জীবনের শেষ কথা নয়। আমি হাসপাতাল থেকে না ফেরা পর্যন্ত ধীর ভাবে অপেক্ষা করবেন। তারপর দুজনে মিলে একটা কিছু ভেবে ঠিক করা যাবে।—বিকাশ।'

এবার বুঝেছে অনুসূয়া। বেশ মর্মে মর্মে বুঝেছে। তার

বুক কাঁপছে থর থর করে—কোন মধুর উচ্ছ্বাসে নয়, নির্মম আশঙ্কায়। চিঠিটা আঙুল গলিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। চোখের সামনে ছেড়া খামের টুকরা আর টাইপ করা এক গুচ্ছ কাগজের ফাইল, যার পাতা ওল্টাবার সাহস আর অবশিষ্ট নেই অনুসূয়ার বুকে। 'আপনাব মনের বলিষ্ঠতা আমাকে প্রেরণা দেয়'। মনের বলিষ্ঠতা···চরিত্রের দৃঢ়তা······ কভারের পাতা ওল্টালো অনুসূয়া। ভাল করে তাকালো প্রথম পৃষ্ঠায়।

মুলতান সহরের রাম গলির শিউরাম খোসলার ছেলে ব্রিজনারায়ণ খোসলা লাহোর মেডিকাল স্কুল থেকে পাশ করে ১৯৪০ সালের জানুয়ারীতে ঢুকেছে ফৌজে। তখন তার বয়স আঠাশ। লম্বা ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। ছাতি······

পাতা উল্টে গেল : ব্রিজনারায়ণের স্ত্রীর নাম চান্দু। চান্দু তার ওয়ারিশ। বাচ্চা আছে দুটি—সন্তরাম আর দেওধর। অনুসূয়ার কান গরম হয়ে উঠল, চোখে জ্বালা ধরল, মাথার মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল।

তারপর আছে ট্রেনিং আর চাকরীর অদল বদলের খবর। চাকরী পাবার দেড় বছর বাদে সে লেফটেনান্ট থেকে ক্যাপ্টেন হয় কিন্তু সিভিল লাইনে মাতলামীর অপরাধে দু'মাসের জন্য আবার তার পদাবনতি হয়েছিল।

সেকেন্দ্রাবাদ। সেকেন্দ্রাবাদের ইতিহাসে অনুসূয়ার উত্তেজিত মন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল : হাসপাতালের নার্স

ফিলোমিনা এলিস ওর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিল কমাণ্ডান্টের কাছে। বিভাগীয় তদন্তের পর কমাণ্ডান্ট ওকে অপরাধী সাব্যস্ত করে স্থায়ীভাবে পদাবনতির শাস্তি দিয়েছিলেন কিন্তু সে ফিল্ড সার্ভিসে যেতে রাজী হওয়ায় শাস্তি প্রত্যাহার করা হয় এবং তাকে বত্রিশ নম্বর এ্যাডভান্স বেস হস্পিটালে বদলী করা হয়।

আর পড়বার প্রয়োজন নেই অবশ্য। কিন্তু 'বলিষ্ঠ মন' তার। কাজেই : বত্রিশ নম্বর এ্যাডভান্স বেস হস্পিটাল অর্থাৎ গোহাটীতে কাজে জয়েন করার দশ দিন বাদেই খোসলাকে মৃত এবং গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করা হয় একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের ঘরে। সেখানে অ্যামেরিকান আর্মির একজন সার্জেণ্টকেও আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেই মেয়েটিকে নিয়ে তুজনের মধ্যে ডুয়েল হয়েছিল বলে মেয়েটি নিজেই ঘোষণা করেছে। আমেরিকান কোর্ট মার্শাল মার্কিন সার্জেণ্টের বিচার করছে। মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বে-কসুর।

ফাইলের শেষ পৃষ্ঠায় গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে খোসলার দেনা পাওনার একটা হিসাব। সব শুদ্ধ মোট বাইশ শ' টাকা অগ্রিম নেওয়া ছিল তার। সে টাকা আদায় হবার সম্ভাবনা লোপ পাওয়ায় প্রধান সেনাপতির অনুমতিক্রমে হিসাবটা বই থেকে মুছে ফেলা হয়েছে।

ফাইল বন্ধ করল অনুসূয়া। চোখে তার জল নেই, বুকে নেই কান্না। শুধু মাথার শিরা গুলো এমন উন্মত্ত

দাপাদাপি করছে যেন ছিঁড়ে পড়বে। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ঘর বাড়ী টেবিল চেয়ার আলো আঁধার সব যেন প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করল অনুসূয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেল তার চেতনা। প্রথমে মাথাটা হেলে পড়ল চেয়ারের হাতলে, তারপর চেয়ার উল্টে দেহটা লুটিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা সানের মেঝেয়। শব্দটা হল বেশ জোরেই, গোঙানীটা কর্কশ ও করুণ। তখন রাত দশটা বাজছে পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের পেটা ঘড়িতে। ছুটে এসে ছোটেলাল দেখল রক্তের স্রোত বইছে ঘরের মেঝেয়। চোখের পলকেই তার প্রাণ উড়ে গেল আতঙ্কে। লছমনিয়াকে হাঁক দিয়ে ডেকেই সে ছুটল হাসপাতালে বিকাশকে খবর দিতে।

সেই রাত্রে বাড়ীর কারও খাওয়া হল না, ঘুমও হল না। ডবল পাওয়ারের আলো জ্বলা রইল সারা রাত্রি। চুল্লী দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উর্ধ্বাকাশে কুয়াশায় মিশে গেল। তিনটে মানুষ নিদারুণ উৎকণ্ঠায় ছুটোছুটি করল ঘর থেকে ঘরে, হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে।

শেষ রাতে চুল্লীর পাশে চেয়ার টেনে একটা সিগারেট ধরিয়ে বসল বিকাশ। চিন্তায় ভাবনায় খাটুনিতে আর দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের ধাক্কায় মুখটা তার শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে।

সাহেবের দিকে তাকাতেই মায়া হচ্ছিল ছোটেলালের। সাহেবের পাশে নীরবে এসে দাঁড়ালো সে।

'বহুত মুস্কিল ছোটেলাল···বহুত মুসিবত। খোসলা মর গয়া।'

ছোটেলাল জবাব দিল না। আজও পর্যন্ত সে সঠিক বুঝতে পারেনি ঘটনাটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে। কখনও মনে হয় খোসলা এই মেয়েটির জীবনের নায়ক, আবার কখনও বা সাহেবকেই নায়ক বলে মনে হয়। অনুসূয়া আগাগোড়াই রহস্য তার কাছে। মিলিটারী অফিসারদের জীবনে মেয়েরা আসে কি ভাবে, কি রূপে এবং কখন, সে সম্বন্ধে তার কিছুটা ধারণা আছে। বাইরে থেকে কোন মেয়েকেই সঠিক চেনা যায় না। জোয়ান পুরুষের জন্য জোয়ান মেয়ের প্রয়োজন হয়। মিলিটারীর লোকেরা সব সময় পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারে না, কাজেই জোয়ান মেয়ে তারা সংগ্রহ করে নানা ভাবে। এ সব নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাথা ঘামাতে গেলে মনিবদের বিরাগ-ভাজন হবার আশঙ্কা আছে বলে সে নীরব থাকতেই ভালবাসে। কিন্তু অনুসূয়া এবং বর্তমান সাহেব তার কাছে সত্যিই এক বিস্ময়। ওরা দুজন যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখে। উচ্ছলতা আছে, উচ্ছৃঙ্খলতা নেই ওদের মধ্যে। বিস্ময়ের বড় বিস্ময়, রাত্রে লছমনিয়াকে অনুসূয়ার পাহারায় লাগানো। প্রথম দিন তার নিজেরই কেমন কেমন

লেগেছিল। সাহেবদের মেজাজ মতলব সহজে তো বোঝা যায় না। অনুসূয়া আর বিকাশের মাঝখানে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে একটু যে ভয় ধরেনি তাও নয় তবুও সাহেবের হুকুম মানতে বাধ্য হয়েছে। তাও তো নিজের বেলায় মানতে পারে নি সে, ছেলেটাকে নিয়ে নিজের ঘরেই শুয়েছে। ভয় ছিল সাহেব চটতে পারেন, কিন্তু চটেন নি। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, রাত্রে শোবার পর সাহেব মেমে যে আর সাক্ষাৎ হয়না তার জীবন্ত সাক্ষী লছমনিয়া। শুধু প্রথম দিন নয়, দিনের পর দিন। সাহেব হাসে খেলে খায় দায়, মেমসাহেব হাসে খেলে গান গায়। তুজনে খুব ভাব তবুও তুজনে ছাড়াছাড়ি। রাত্রে খাওয়ার পর হাসিমুখে তুজনে বিদায় নিয়ে চলে যায় যে যার ঘরে। তারপর আবার তাদের দেখা হয় তুপুরে খাবার সময়, কারণ সাহেব ভোরে যখন অফিসে যান তখন অনুসূয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকে পাশের বন্ধ কামরায়।

'আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, সকাল বেলায় হাসপাতালে দিয়ে এসো। তু'দিন বাদেই কাজে জয়েন করব।'

'বহুত আচ্ছা সাব।'

বিকাশ কলম বার করে একটা দরখাস্ত লিখে ওর হাতে দিল।

'খাওয়া তো আপনার হল না সাহেব, চা খাবেন একটু?'

'বানাও।'

বাল্বের নীচে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে। উদাস নয়নে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে বিকাশ। অনেক অদ্ভুত ভাবনা তার মন ছুঁয়ে যায়—'এই পৃথিবীটা হচ্ছে বিরাট রঙ্গমঞ্চ আর আমরা হলাম তার অভিনেতা অভিনেত্রী। নাটকের স্থুরু জানি না, শেষ জানি না, বিষয়বস্তু জানি না। পুতুল নাচের পাত্রপাত্রী যেন আমরা।' মুলতান থেকে সেকেন্দ্রাবাদ প্রায় হাজার দুই মাইলের পথ আর কলকাতা থেকে আম্বালাও হাজার মাইলের বেশী। মুলতানের ছেলে ডুয়েল লড়ে মারা গেল গৌহাটীতে তারই ধাক্কা এসে লাগল আম্বালার এই বাঙলোয়। আর সেকেন্দ্রাবাদের শিক্ষয়িত্রী মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। একটি শিশু ভ্রূণত্বপ্রাপ্তির আগেই বিনষ্ট হল মাতৃজঠরে। ভাবতে গেলে ভোজবাজির মত লাগে। কি করবে এবার অনুসূয়া? তার জীবনে খোসলার যে দান স্থায়ী হতে পারত তা আজ রাত্রে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। খোসলা নেই, নেই তার শিশু, কিন্তু তার প্রবঞ্চনার স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে অনুসূয়াকে। কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করে সারা জীবন বিঁধবে, অনুসূয়ার মনকে ক্ষত-বিক্ষত করবে। মিথ্যার জঞ্জালে ভরা জীবনের একটি বসন্ত অসংখ্য অনাগত বসন্তের শুভ্র কামনাকে বিষাক্ত করে তুলবে।

'মেমসাহেব চোখ মেলেছেন।'—চুপি চুপি বলে যায় লছমনিয়া।

বিকাশ ছুটে যায় পাশের ঘরে। নাঃ, চোখ দুটি শান্ত সমাহিত। শুধু কপালে যন্ত্রণার রেখা, ঠোঁটে বেদনার বিষণ্ণতা। নাকের পাশে কালো দাগ একটা। বিকাশ আলগোছে মুছে ফেলে সেটা। তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে অনুসূয়ার উষ্ণ কপাল চেপে ধরে। আধমোছা কুঙ্কুমের রক্তিম আভা জড়িয়ে যায় হাতে। একান্ত অসহায়ের মত নির্জীব পড়ে আছে যৌবনের অসংখ্য মায়ারহস্যে ঘেরা প্রবঞ্চিত প্রেমিকা। বিকাশ জানে সকালের আগে ওর চেতনা ফিরে আসবে না। ওখানে অমনি ভাবেই কাটবে ওর বাকী রাতটা। কিন্তু ওর এই ঘুমন্ত অসহায় ভাবটা ভারী করুণ। আকুল করে তোলে মনকে। ওর সরল বিশ্বাস আর একান্ত নির্ভর-শীলতাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে যে লোকটা তার হৃদয় বিশেষ ধাতুতে তৈরী নিশ্চয়ই। বিভ্রান্তি ধরে যায় বিকাশের। মিলিটারী জীবনে এমন একটা অস্বস্তিকর অস্বাভাবিকতা আছে যার জন্যে মানুষ ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে ওঠে। এই অসামাজিক জীবন মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়—এমনি অমানুষ করে তোলে মানুষগুলোকে। জীবনটা যতই স্বল্পায়ু ক্ষণস্থায়ী বলে ধারণা জন্মে ততই সমস্ত প্রবৃত্তি এক সঙ্গে নিবৃত্তি খোঁজে। 'দুদিনের বেঁচে থাকাকে' সমগ্রভাবে উপভোগ করার উদগ্র কামনা মদ মেদ হুল্লোড় আত্মবিস্মৃতির পথে টানতে টানতে

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর গহ্বরে নিয়ে ফেলে। জীবনের মূল্যবোধ আর নীতিবোধের মৃত্যুই তো মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু।

চা নিয়ে এল ছোটেলাল।

বিকাশ আবার চলে এল নিজের কামরায়।

জ্ঞান ফিরে এলে নতুন একটি অবস্থার কথা বুঝতে পারবে অনুসূয়া। হয়ত দুঃখ পাবে কিংবা হয়ত সুখীই হবে। তার নারী জীবনে এত বড় বিড়ম্বনা, এত বড় পরাজয় আর তো কিছুই হতে পারেনা। যে শিশু তার ব্যর্থতার, পরাজয়ের, প্রবঞ্চনার কলঙ্কময় প্রতীক, সে শিশু পৃথিবীর আলো দেখবার আগেই যে অন্ধকারের আবর্জনায় লুপ্ত হয়েছে, তাতে ব্যথিত হবার কিছু নেই। অন্তত বিকাশ তেমন কিছু খুঁজে পায়না। তাই যেন ভাবে অনুসূয়া। তার মাতৃত্ববোধ যেন তার মর্যাদা বোধকে ছাপিয়ে না ওঠে। তার ধিক্কার যেন তার স্নেহের কাছে মাথা না নোয়ায়। মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াক অনুসূয়া। জীবনের দুঃস্বপ্নকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিক মন থেকে।

ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে ঘুমের নেশা ধরে যায়। সারাদিন ছুটোছুটি ভয় ভাবনা দুশ্চিন্তায় কেটেছে। অশুভ সংবাদের ভগ্নদূত হয়ে অনুসূয়ার সামনে দাঁড়াতে সাহস হয়নি বলে ছুতো করে হাসপাতাল ঘুরে এসেছে। বাড়ী ফিরে অচৈতন্য অনুসূয়ার রক্তাপ্লুত দেহ দেখে প্রথমে তো তারই হার্ট ফেল করার উপক্রম হয়েছিল। কিছু শোনবার আগে

মনে হয়েছিল, আত্মহত্যা করেছে অনুসূয়া রিভলভারের গুলিতে কিন্তু একথা তার মনে হয়নি যে রিভলভারটা নিজের কোমরেই আটকানো রয়েছে।

ঘুমে ঢুলে আসে চোখ। জেগে থাকবারই বা প্রয়োজন কি? ব্রোমাইড দেওয়া আছে অনুসূয়াকে। সূর্য ওঠার আগে ওর জেগে ওঠার সম্ভাবনা নেই। জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে লেপ মুড়ি দিল বিকাশ এবং ঘুমিয়ে পড়ল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

অনুসূয়ার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষায় কাটল তার সারা সকাল। বিকাশ জানে সে অতি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। ওর মুখো মুখি গিয়ে দাঁড়ানো যে কত কঠিন হবে, তা অনুভব করতে পাবে। কি করবে এবার অনুসূয়া? ফিবে যাবে আবার সেকেন্দ্রাবাদে? ফিরে যাবে মা বাবার কাছে? ফিরে যাবে পুরাতন পরিবেশে? ফিরে যাবে নিশ্চয়ই। বাইরে থেকে কেউই হয়ত টের পাবেনা তার জীবনের গতি কোন খাত থেকে কোন খাতে সরে গেছে। শুধু নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে থাকবে সে। যারা ওর কানে সন্দেহের গুঞ্জরণ তুলেছিল, যারা ভ্রূ কুচকেও ওর হাসিকে মলিন করতে পারেনি, ওর উদ্যমকে দমাতে পারেনি, ওর গর্বোদ্ধত উচ্ছ্বাসকে সংযত করতে পারেনি, তারা শুধু হাসবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। হাসতে হাসতে ফেটে পড়বে আব সেই হাসি

তীরের ফলার মত বিঁধবে ওর কানে, ধুলোয় লুটিয়ে দেবে ওর অস্তিত্বকে। চোখের জলে এ অবমাননার মুক্তিস্নান হবেনা। যৌবনের বেদনময় ক্ষণিক বিমুগ্ধতা তার সমগ্র সত্তাকে কলুষিত করেছে বাইরের মানুষের কাছে, নিজের কাছেও।

কিন্তু তারই বা এত ভাবনা কেন অনুসূয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে। তার জীবনে নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা অনুসূয়া। ওর জন্য মিছিমিছি এত ভাবাভাবি করে লাভ কি? সুস্থ হয়ে উঠলেই চলে যাবে। জীবনে হয়ত আর কোন দিনই দেখা হবেনা।

সকাল গড়িয়ে গেল। ঘুম ভাঙ্গেনি অনুসূয়ার। বিকাশের ভয় লাগে। ব্রোমাইড বেশী হয়ে যায়নি তো? খাওয়া সেরে অনুসূয়াকে নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করল বিকাশ। নাড়ী চলছে ঠিকই তবে ব্রোমাইডের ডোজটা একটু বেশীই হয়ে গেছে বোধ হয়।

বিকেলে হঠাৎ হাসপাতাল থেকে এক হাবিলদার এসে হাজির। বিকাশ আম্বালায় ফিরে এসেছে জেনে কমাণ্ডিং অফিসার সন্ধ্যায় ওকে ডিউটিতে জয়েন করতে অনুরোধ করেছেন, কারণ দুজন ক্যাপ্টেন নাকি একসঙ্গে বসন্তের কবলে পড়েছেন। এ অবস্থায় নতুন লোক না আসা পর্যন্ত হাসপাতালের কাজ চালানোই মুস্কিল।

দ্বিধা দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে হল শেষ পর্যন্ত। চৌবেকে

খুশী না রাখলে ভদ্রলোক হয়ত তাকে ফিল্ড সার্ভিসেই পাঠিয়ে দেবেন রাগ করে।

'মেমসাহেবের জ্ঞান ফিরেছে সাহেব, তবে কথা বলতে পারছেন না। শুধু ঠোঁট নাড়ছেন।' —লছমনিয়া শুনিয়ে গেল।

বিকাশ ঢুকল ঘরে। জ্ঞান ফিরেছে সত্যিই তবে এখনও চোখে ঘুমের ঘোর, শূন্য উদাস দৃষ্টি। বিকাশ তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে, কথা বললনা। চোখের চাহনি দেখে বোঝা যায় না কাউকে চিনতে পারছে কি না।

ভালই হল। এখন আর তার হাসপাতালের কাজে যেতে বাধা থাকল না।

'গরম দুধ দাও ব্রাণ্ডি মিশিয়ে। আর দেখো যেন বিছানা ছেড়ে না ওঠে, বুঝলে ছোটেলাল। আমি যাবো রাত্রে ডিউটি দিতে। আমার খানা পাঠিয়ে দিও হাসপাতালে।'

'জি সরকার, লেকিন আপনি চলে গেলে বহুত মুশকিল হবে। একলা একলা লছমনিয়া ওঁকে সামলাতে পারবে কি? আমার ডব লাগে সাহেব।'

'কিছু না কিছু না। যদি এমন তেমন কিছু হয় তাহলে হাসপাতালে খবর দিয়ো, চলে আসব।'

সেজে গুজে বেরুবার সময় আর একবার অনুসূয়ার ঘরে ঢুকল বিকাশ। অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এখনও তার দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন, চোখ স্তিমিত, দেহ প্রায় নিস্তব্ধ।

চোখের কোনো কাজল নয়, দুর্বলতার কালিমা। বিকাশ ওর হাতটা তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে, মুখের উপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দিল গভীর মমতায়।

'ভাল আছেন একটু?' একেবারে মুখের কাছে মুখ এনে সস্নেহে প্রশ্ন করল বিকাশ।

ঠোঁট দুটো সামান্য একটু নড়ে উঠল, মাথাটাও। কিন্তু কোন আওয়াজ বেরুলো না। চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছে দিল বিকাশ। ফুলের মত নরম আর স্পর্শকাতর যেন অনুসূয়া,—ভালবাসার উত্তাপে সহজ স্বাভাবিকতায় প্রস্ফুটিত হয়, পরিবেশকে সুবাসিত করে। বিকাশের মনে হয়, কদিনের সান্নিধ্যে তার হৃদয়ের অনেকখানি জুড়ে বসেছে অনুসূয়া।

এটা মিলিটারী হাসপাতাল হলেও যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক অনেক পেছনে এর অবস্থিতি। এখানে অধিকাংশই জাঠ, রাজপুত এবং শিখ। সেপাই থেকে সুবাদার পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর রোগীই আছে, নেই কেবল কমিশন্‌ড্‌ অফিসার। তাঁরা সকলে শ্বেতাঙ্গ না হলেও বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালেই তাঁদের ভর্তি হবার নিয়ম।

খুব একটা মুমূর্ষু রোগী কেউ না থাকলে রাত্রে ডাক্তারদের কোন কাজই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে নার্স আর নার্সিং অর্ডারলিরাই চালায় হাসপাতাল। নার্সরা বেশীর ভাগ

আসে মালাবার থেকে—কালো কালো দ্রাবিড় মেয়ে, জাতিতে খৃষ্টান। নাম দেখে টের পাওয়া যায় না দেশী কি বিলাতী, চেহারা দেখে বোঝা যায় বিদেশী হবার প্রাণপণ চেষ্টা আছে ওদের। হিন্দী শিখেছে সামান্য সামান্য, ঠাট্টা মস্করা করে রোগীদের সঙ্গে, অফিসার দেখলে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। নতুন চাকরী পাওয়া নার্স সব। ওদের বলা হয় সিষ্টার। হাসপাতালের অদূরে ওদের কোয়ার্টার। বিকেলে তার আশে পাশে ভীড় লাগে সৈনিকদের। তাদের সঙ্গেই নার্সরা সেজে গুঁজে টোঙ্গায় চেপে বেরোয়,—যায় সিনেমায়, বাজারে, রেস্তোঁরায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে হোটেলের কামরায় চলে লেন দেন। ফিসফিসিয়ে দেনা পাওনার কড়াগণ্ডা নিয়ে অনুযোগ অভিযোগ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। আবার রাত ন'টার মধ্যে কোয়ার্টার সরগরম। ওদের মধ্যে যাদের চেহারা চলনসই, ঠমক ঠামক চমকদার তাদের চাহিদা বেশী। তারা শোবার আগে বাল্বের নীচে বসে সন্ধ্যার উপরি পাওনার হিসাব মেলায়। জিভে আঙ্গুল ভিজিয়ে নোটের তাড়া গোনে। তারপর হাতব্যাগ থেকে সন্ধ্যায় পাওয়া সিগারেটটা সন্তর্পণে বার করে দেশলাই জ্বালিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়।

এসব অবশ্য শোনা গল্প। বিকাশ বিশ্বাসও করে না, অবিশ্বাসও করে না। নিস্তব্ধ রাতে নিজের কামরায় বসে সে ভাবে অনুসূয়ার কথা।

'আসতে পারি ভিতরে ?'—নারী কণ্ঠ।

'আসুন।'

মিস মেরী প্যারেরা—গোয়ানীজ। বয়স কত বোঝবার উপায় নেই তবে বিগত যৌবনা ঠিকই। তিন নম্বর ব্লকের নার্স।

'কি চাই বলুন।'

'কিছু নয়, এমনিই এলাম। একলা বসে আছেন তাই।'

'বসুন আপনিও।' মেরী টেবিলের সামনে এসে বসল।

'যুদ্ধ কবে শেষ হবে বলতে পারেন ক্যাপ্টেন ?'—হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করে মেরী।

'বলা তো মুস্কিল। এখনও তো আমাদের প্রতিআক্রমণই স্থুরু হয়নি। আপনার কি মনে হয় ?'

'আমার তো মনে হয় আরও পাঁচ বছর চলবে। আর যত চলে ততই ভাল।'

ভারী আশ্চর্য লাগে বিকাশের। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে মেরীর কি এমন লাভ হবে ?

'কতলোক করে খাচ্ছে দেখুন না। মালাবারের কোন মেয়ে আর বেকার নেই। টাকা লুটছে দেদার। আমাদের কোয়ার্টারে যান না, টাকার আণ্ডিল নিয়ে বসে আছে এক একটা মেয়ে। সৈনিকদের কাছে কালা ধলা নেই স্যার, ওরা নরম মাংস পেলেই ট্যাঁক খালি করে দিচ্ছে।'

'কিন্তু এসব ভাল নয়। কত রকমের জটিল অসুখে পড়ছে দেখছেন তো।' বিকাশ ওকে থামাবার চেষ্টা করে। যৌন বিকারের কাহিনী শুনতে শুনতে ওর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। বিশেষ করে কোন মেয়ের মুখে এসব শুনতে বড় অশ্লীল লাগে। গা ঘিনঘিন করে।

মেরী চুপ করে থাকে কয়েক মুহূর্ত তারপরই হঠাৎ অনুনয়ের সুরে বলে, 'আমার একটা উপকার করবেন ক্যাপ্টেন ?'

'বলুন।'

'দয়া করে কমাণ্ডাণ্টকে ধরে আমায় আসাম কিংবা কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। আপনার সঙ্গে ওঁর তো খুব ভাব দেখি।'

'সে কি বলছেন, ও দুটো ষ্টেশনই তো ফিল্ড সার্ভিসের এলাকায়। সাধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চান ?'

'হ্যাঁ চাই। ইউনিফর্ম যখন পরেছি তখন আমাদের আর যুদ্ধক্ষেত্র শান্তিক্ষেত্র কি !' তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বলে, 'আমেরিকানরা টাকা ওড়াচ্ছে দু'হাতে। ছোট বোন আমার ওখানে থাকে কিনা। চিঠি লিখেছে—দু'হাতে টাকা পিটে লাল হয়ে গেছে……।' মদের গন্ধ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেরী স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

বিকাশ বলল, 'আচ্ছা বলে দেখব কমাণ্ডাণ্টকে। এখন যান ব্লকে। অনেক্ষণ এসেছেন।'

সে চলে যাবার পর ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আমেদ ঘরে ঢুকলেন।

'হ্যাল্লো মজুমদার, তোমার ঘরে 'মেরী মাতা' এসে ঢুকেছিলেন কোন মতলবে--বাজারের মেয়েমানুষটা ?'

'বদলী হতে চায় আসামে। সেখানে নাকি আমেরিকানরা টাকার হরিলুট দিচ্ছে।' বিকাশ হাসল।

ইদ্রিস আমেদ মিলিটারীর পাকা চাকুরিয়া। আগে ছিল কম্পাউণ্ডার, যুদ্ধের সময় বিশেষ এক বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ করার পর কমিশন পেয়েছে। মিলিটারীর খুঁটিনাটি ওর নখদর্পণে।

'বাজারের মেয়েমানুষ অনেকেই যুদ্ধের দৌলতে সিষ্টার হয়েছে, বাকী যা ছিল ঢুকেছে ওয়াকিতে। ব্যবস্থটা ভালই, বুঝলে মজুমদার, বাইরে আর যেতে হবেনা কাউকে। তোমার ওসব খেয়াল টেয়াল আছে নাকি ?······এ্যাঁ।'

'রক্ষে কর বাবা, এখন আমার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ইউনিফর্ম গা থেকে নামিয়ে তোমাদের এই মিলিটারীর হাত থেকে রেহাই পেলে বাঁচি। তুমি তো জানো, আমরা এসবে অভ্যস্ত নই।'

'সে কি হে, এই বয়সে এত বৈরাগ্য ! তোমার কোনই ভবিষ্যৎ নেই।'

ইদ্রিস আমেদ চেয়ার টেনে বসে পড়ে। সিগারেটের প্যাকেট বার করে রাখে টেবিলে। তারপর গল্পগুজবে কেটে

যায় বাকী রাতটা। ইদ্রিস আমেদের অভিজ্ঞতা নানা দেশের নানা জাতির। ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে ও প্রায় সারা পৃথিবীটাই ঘুরেছে। বলে, 'কিন্তু যাই বল ভায়া, আমাদের ইণ্ডিয়ার মত দেশ হয় না। ভারতীয় সৈনিক তো অন্য দেশের সৈনিকের তুলনায় অনেক সৎ এবং ভদ্র। ও দেশের কথা যদি শোনো তাজ্জব বনে যাবে। শোন একটা গল্প। কায়রোর মস্ত ব্যবসায়ী নাগিব পাশা মিলিটারী যান-বাহনে বেআইনী মালপত্র আনা নেওয়া করত। আমি ছিলাম তার আড়কাঠি। সেই সূত্রে তার পরিবারে আমার অবাধ আনাগোনা সুরু হয়। নাগিবের মেয়ে দিলওয়ারা —আহা বসরার তাজা গোলাপ। যেমনি গায়ের রঙ্ তেমনি শোঁকিয়া। নয়নের তীর চালিয়ে লাখো নওজোয়ানের দিল টুকরো টুকরো করে দিতে পারত। বললে বিশ্বাস করবে না মজুমদার সে আমার প্রেমে পড়েছিল, বলেছিল শাদী করবে। ওব বাপেরও অমত ছিলনা। আমি বললাম, মেরী জান্, তোমাকে শাদী করে ঘরে তো ধরে রাখতে পারবনা। তুমি উড়বেই। তার চেয়ে ওসব শাদী ফাদীর বাত ছেড়ে দিয়ে এসো ফুর্তি লোটা যাক যে কদিন আছি। রাজি হলনা। প্রথমে রাগ হয়েছিল কিন্তু পরে শ্রদ্ধা হল ওর উপর। আমি আর যেতাম না নাগিবের বাড়ী। মিশর সহরে তখন নানা দেশের শ্বেতাঙ্গ ফৌজ গিজগিজ করছে। পথে ঘাটে খাঁকি ছাড়া আর কিছু

দেখাই যায়না। মাতাল বদমায়েস লম্পটে ছেয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন নাগিব এসে বললে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। দিলওয়াবাকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাজার থেকে ফেরার পথে গায়েব হয়েছে। পাওয়া গেল নীল নদীব পারে মৃত-ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়। দলবদ্ধ অত্যাচারের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। বললে বিশ্বাস করবে না মজুমদার, আমার মত কঠিন মানুষও সেদিন নীল নদীর জলে অশ্রু বিসর্জন না করে পারেনি। সেদিন থেকে আমি ওসব মতলব একদম ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু জীবনে যা স্বেচ্ছায় হারিয়েছি তা আর কখনও ফিরে পাবোনা। ভাবলে আজও কান্না পায়।'

পেটা ঘড়ীতে বাজল পাঁচটা। ইদ্রিস আমেদ মাথায় টুপি চাপিয়ে বিদায় নিল। এবার তাদের ডিউটি শেষ।

ইদ্রিসের বোমাঞ্চকব কাহিনী শুনতে শুনতে এতক্ষণ অনুসূয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল বিকাশ। বাড়ী ফেরার পথে আবার সেই অস্বস্তিকর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কাল তো একরকম গেছে। আজ সুস্থ সচেতন অনুসূয়ার সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

প্রাঙ্গণের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ছোটেলাল ছুটে এল, 'সাহেব সর্বনাশ। মেমসাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে—ভুল বকছেন সকাল থেকে।'

বিকাশের বুকটা ছাত করে উঠল, 'ভুল বকছে ? কি রকম ?'

'কিছু বুঝি না সাহেব। মনে হচ্ছে যেন রেগে আগুন

হয়ে আছেন। লছমনিয়ার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছেন। ওর তো ভয় ধরে গেছে।’

তাড়াতাড়ি কামরার ভেজানো দরজা খুলে দুয়ারে দাঁড়িয়েই অনুসূয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হল বিকাশের। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল অনুসূয়া, ‘বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও স্কাউণ্ড্রেল···তুমিই খুন করেছ খোসলাকে, হ্যাঁ তুমিই··· বেরিয়ে যাও বলছি····’ টেবিলের উপর থেকে কাঁচের গ্লাস তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুড়ে মারল বিকাশের দিকে, দেওয়ালে লেগে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল গ্লাসটা। বিকাশ দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। উত্তেজনায় জোরে জোরে হাপাচ্ছে অনুসূয়া। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দে কেমন যেন মিইয়ে গেছে হঠাৎ। হাতের কাছে ছুঁড়ে মাবার মত আর কিছু নেই আপাতত।

বিকাশ দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল অনুসূয়ার একেবারে সামনে। চোখ দুটো ওর জবাফুলের মত লাল। শিরা ফুলে উঠেছে কপালের। উত্তেজনার ক্লান্তিতে ঠাণ্ডার মধ্যেও স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে চোখের পাতায় আর কপালের ভাজে ভাজে। বিকাশ হাত বাড়ালো ওর দিকে।

‘না···না ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমায়···অশুচি...অশুচি। আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাক····দূরে···সরে থাক।’

নিজের মধ্যেই নিজেকে যেন গুটিয়ে নেয় অনুসূয়া। সরতে সরতে খাটের কিনারে চলে গেছে। লছমনিয়া ওকে গায়ের জোরে সরিয়ে দিল মাঝখানে।

'কি ব্যাপার। এরকম তো ছিলেন না আপনি।'

'ছিলাম না, তুমি করেছ, তুমি শয়তান···দাও আমার ছেলে দাও···দাও···তুমি তাকে মেরে ফেলবার কে? খোসলাকে কে মেরেছে?···তুমি, ···ইউ আর এ রোগ, অ্যান ইডিয়ট, এ স্কাউণ্ড্রেল···তুমি নিজে না এসে ফাইল পাঠালে কেন? বল···জবাব দাও····তোমার মতলব বুঝিনি নাকি আমি···।'— বিছানা থেকে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে সে।

লছমনিয়া ওকে জোর করে চেপে ধরল বিছানায়। বিকাশ তুলে নিল ওর হাত। কথা বলে লাভ নেই। মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়েছে। তার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। শুধু অনুসূয়ার অসুখের জন্য নয়, তার বিরুদ্ধে অনুসূয়ার অভিযোগের ধরন দেখে।

হাতটা লোহার মত শক্ত, মনে হয় যেন দম বন্ধ করে রেখেছে অনুসূয়া কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ সে ঢলে পড়ল বিছানায়।

'খুব ঠাণ্ডা জল দিয়ে ওর মাথা ধুইয়ে দাও ছোটেলাল। দুধের বদলে ঘোল খেতে দিয়ো। জানলা খুলে দাও। লেপ মুড়ি দিয়ে শুতে দিও না আর যদি পার তাহলে ভাল করে স্নান করিয়ে দিও ঠাণ্ডা জলে।'

নিজের কামরায় ঢুকে কয়েক মুহূর্ত অস্থিরভাবে পায়চারী করল বিকাশ। অনুসূয়ার স্নায়বিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। এ অবস্থা ভাল নয়। সত্যিই স্থায়ীভাবে মাথা খারাপ হয়ে

যেতে কতক্ষণ ? মানুষেব কলকব্জা কত যে তাড়াতাড়ি বিগড়ে যায়। কিন্তু এভাবে আর ওকে নিজেব দায়িত্বে রাখা ঠিক নয়। কত বকমের জটিল পরিস্থিতিব উদ্ভব হতে পাবে। বিশেষ করে ওকে একজন এক্সপার্ট ডাক্তার দেখানো একান্ত প্রয়োজন।'

লেঃ কর্ণেল চৌবেকে দিয়ে দেখিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোক স্নেহশীল, প্রবীন, দরদী।

স্নান সেরে সে চৌবেব বাঙলোয় গেল। তিনি ঘটনাব গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন।

'আবে মজুমদাব তুমি যে বেঘোবে মাবা পড়বে হে, কবেছ কি কাণ্ড! সন্দেহজনক চবিত্রের অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে ঘরে থাকতে দিয়েছ ? ও যদি বদমাইস হয়, ও যদি এখন তোমাব বিরুদ্ধে খোবপোষের মামলা করে, যদি বলে তুমি ওকে প্রথমে ঘরের বার করেছ আব শেষে ভ্রুণহত্যা কবেছ। তাহলে ? যদি খোসলা ফোসলাব গল্প সব বানানো হয় ? তুমি কি হে ? কোথাকাব কোন মেয়ে এসে উঠল তোমার বাড়ীতে আর তুমি তাকে থাকতে দিলে। খেড়ে লোক যা হোক। এখনই বিদায় কর, এখনই। বাড়ীব বার করে দিয়ে তারপর অন্য কথা। চল দেখে আসি। তোমরা বাঙালীরা বড় সেন্টিমেন্টাল।'

'আমি ভাবতেই পাবি নি ব্যাপারটা এতদূব গড়াবে।'

'তা ভাববে কি করে, আকাশের চাঁদ আর ফুলের গন্ধ নিয়ে কবিতা লেখোগে।'

চৌবে বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু বিকাশই বা কি করতে পারত? একটা বিপদগ্রস্ত অনিচ্ছুক মানুষকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে তো দেওয়া যায় না। বিশেষ করে মহিলা।

অনুসূয়া চোখ বুজে পড়ে ছিল। জুতোর শব্দে চোখ মেলল। চৌবে তার হাতের নাড়ি টিপে দেখলেন। বাধা দিল না অনুসূয়া। বিকাশ আর চৌবের দিকে বোকার মত তাকাতে লাগল।

'কখন ঘটেছে ঘটনাটা?'

'পরশু রাত দশটায়।'—জবাব দিল বিকাশ।

'ব্রোমাইড দাও। দেখে তো মনে হচ্ছে স্বাস্থ্যটা ভালই। রক্ত-টক্ত দিতে হবে না বোধ হয়। স্নায়ু ঠাণ্ডা কর।'

যাবার সময় বলে গেলেন, 'একটু ভাল হয়ে উঠলেই বাড়ী থেকে সরাও ওকে। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিও না। সেকেন্দ্রাবাদের ষ্টেসন অফিসারকে চিঠি লিখে জেনে নাও, সত্যিই ও সেখানকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী কি না। তারপর ওর বাপ মার খোঁজ খবর করে দাও পাঠিয়ে, না হয় পুলিসে খবর দাও। হয়ত কেসটা 'জেনুইন' কিন্তু মেয়েদের ব্যাপার, ঝঞ্ঝাট বাধতে কতক্ষণ, বিশেষ করে তুমি এখানে একলা থাক।'

তাকে বাইরে গাড়ীতে তুলে দিয়ে চিন্তান্বিতভাবে পায়ে পায়ে বিকাশ আবার এসে ঢুকল অনুসূয়ার কামরায়। দরজার সামনেই আলুথালু অবস্থায় রক্তচক্ষু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবটা মারমুখী। দেখেই চমকে উঠতে হয়।

কিছু বলবার আগেই সে আরও এগিয়ে এসে শাসানির ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল—'কে? কে ওই লোকটা? কাকে এনেছিলে সঙ্গে করে? কে ওই ভূতটা···বল···বল···বল বলছি।'

বিকাশ শান্তভাবে জবাব দিল, 'উনি খুব বড় ডাক্তার। তোমার অসুখ দেখতে এসেছিলেন।'

'সাট আপ আই সে···অসুখ দেখতে, না আমার সর্বনাশ করতে। আমি ওর সব কথা শুনেছি।'

'কিন্তু তুমি যদি এরকম পাগলামি কর···আমি কি করতে পারি?'

কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড একটি থাপ্পড় এসে পড়ল বিকাশের ডান গালে। অপ্রত্যাশিত আঘাত। বিকাশের সমস্ত শরীর ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। স্তব্ধ হতভম্ব হয়ে অনুসূয়ার বেপথু দেহের দিকে তাকালো সে। উত্তেজনায় তারও শরীর কাঁপছে। ঠোঁটের কোন বেয়ে এক ফোটা তাজা রক্ত টপ করে পড়ল তার কোটের কলারে।

'রক্ত ··· রক্ত ··· ওঃ একি করলাম ··· তোমাকে ··· রক্ত ···বিকাশ'

রক্ত দেখে নার্ভাস হয়ে পড়েছে অনুসূয়া।

ডান হাতখানা বিকাশের রক্তমাখা গালের উপর ঘষতে ঘষতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল হঠাৎ। বিকাশের মুখের মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠিক একইভাবে ওর গালেও একটা চড় মারতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু ওর চোখে জল দেখে হঠাৎ তার কেমন মমতা হল। বলল, 'যাও বিছানায় শুয়ে পড়গে। এ অবস্থায় নড়াচড়া করা উচিত নয়। তুমি জানো আমি ডাক্তার।'

ওর হাত ধরে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল বিকাশ।

'তুমি আমায় অত সমবেদনা দেখিওনা। মারো মারো—ভেঙ্গে দাও দাঁত একটা আমার।'

মুখটা সে তুলে ধরল বিকাশের দিকে। মুখময় চোখের জলের ভিজে দাগ। ক্ষণেকের জন্য সব বিস্মৃত হল বিকাশ। একটি আঘাত পাবার ইচ্ছায় মুখটা তুলে ধরেছে অনুসূয়া কিন্তু আঘাত নয়, অন্যকিছু করার একটা তীব্র প্রেরণা অনুভব করল সে। মাথা নীচুকরে কাছে টেনে নিল অনুসূয়াকে। তার দুটি কামনাতপ্ত ঠোঁট ওর ঠোঁট স্পর্শ করবার মুহূর্তে ছোটেলাল দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। মুহূর্তেই আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল বিকাশ। দুই হাতে অনুসূয়াকে তুলে ধরে বিছানায় শুইয়ে লেপ ঢেকে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে দেখা গেল অনুসূয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে কথা

বার্তা বলেছে। বিকাশ এল দেখতে। হাতটা আগেই এগিয়ে দিল তার দিকে, বলল, 'দেখুন তো, কাল সকাল পর্যন্ত আমি চলে ফিরে বেড়াতে পারব কি না।'

বিকাশ তার হাতটা নিজের মুঠির মধ্যে চেপে বলল, 'কেন কাল সকালে কি ?'

'চলে যাব। আর তো এখানে থাকবার অধিকার নেই।'

কথাটা সে সহজ ভাবেই বলল কিন্তু কান্নার সুরে বাজল বিকাশের কানে।

'আমি তো তোমাকে যেতে বলিনি। যতদিন খুশী থাকোনা। অধিকারের প্রশ্ন কি। কোথায় যাবে তুমি এখন ?'

বিকাশের কণ্ঠে স্নেহ ঝরে পড়ল। সকালের ঘটনার পর সারা দুপুর তার মনে হয়েছে, যে ভাবেই হোক অনুসূয়ার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে গভীরভাবে। সে কথা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে ওর সম্বন্ধে।

'যাবো কোথায় ঠিক করিনি। দেশে ফিরব না। সকলের হাস্যাস্পদ হয়ে বাঁচবার সাধ নেই।'

'একটা কিছু ঠিক না করে তো যাওয়া উচিত নয়। কোথাও স্বাস্থ্যাবাসে গিয়ে থেকে এসো মাস দুই। শরীর তো তোমার খুব দুর্বল।'

'স্বাস্থ্য দিয়ে কি আর করব। এ জন্মের মত সব সাধ আমার মিটেছে। বাকী জীবনটা কোন মতে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল। দিল্লী লাহোর অথবা বেনারসে একটা চাকরী পেলেই আমার হবে। এখান থেকে বেনারসেই যাব প্রথম। সেখানে কোন মেয়েদের আশ্রমে গিয়ে উঠব। অন্য কোথাও তো সে সুবিধা পাওয়া যাবে না।'

অনুসূয়ার কণ্ঠস্বরে চরম হতাশা। বিকাশের বুকটা গুরু গুরু করে ওঠে। অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধ ছিল অনুসূয়ার। লক্ষ্ণৌ যাবার আগে রেল পুলের উপরে বসে ভবিষ্যৎ জীবনের উচ্ছ্বসিত পরিকল্পনা শুনিয়েছিল। প্রেমিক স্বামী, দুষ্টুদুষ্টু ছেলে মেয়ে, সুসজ্জিত গৃহ, শান্তিময় পরিচ্ছন্ন জীবন। সবই কি ব্যর্থ হবে ?

'কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমারও দায়িত্ব আছে। যেখানে সেখানে যাবো বললেই কি যাওয়া চলে ?'

'কিন্তু না গেলে তো তোমরা আমায় ধরিয়ে দেবে পুলিসের হাতে। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে বলছিলে।'

'চৌবে অনুভব করতে পারেন নি। উপরে উপরে দেখেছেন ব্যাপারটা।'

'তুমি ?'

বিকাশ একটু ভেবে বলল, 'আমার কথা তো তোমার অজানা নেই। কিন্তু থাক ওসব কথা, এখন বল তোমার শরীর কেমন ?'

'ভাল আছি। তোমার মুখের ব্যথা সেরেছে ?'

বিকাশ হেসে বলল, 'অত সহজে কি সারে বিরাশী সিক্কা ওজনের চড়। একটা দাঁত নড়ে গেছে।'

অনুসূয়ার উজ্বল মুখটা মলিন হয়ে গেল।

সকালে আবাব দেখা হল দুজনে। বিকাশ যখন বাড়ী ঢোকে অনুসূয়া বারান্দায় পায়চারী করছিল। দূর থেকে দেখে তার খুশী লাগল। তাহলে এ ধাক্কা সামলে নিয়েছে অনুসূয়া।

আরও কটা দিন কেটে গেল। একদিন সকালে সংবাদ-পত্র হাতে অনুসূয়া এসে দাঁড়ালো বিকাশের সামনে।

'আমার জন্য একটা চমৎকার চাকরী অপেক্ষা করছে।'

'কোথায় ?'

'ফৈজাবাদে। মেয়েদের নতুন স্কুল খোলা হচ্ছে। বি-টি পাশ হেড মিষ্ট্রেস চাই। মাইনে দেড়শ'।'

দিন আষ্টেক বাদে সত্যিই নিয়োগ পত্র এলো। বিকাশ নীবব ছিল এতদিন। নিয়োগপত্র দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ওব দিকে।

'এবাব তো আর যেখানে সেখানে যাওয়া নয়, বাধা দেবার কিছু নেই।'

'বাধা দেবার কোন দিনই কিছু ছিল না।' বিকাশ একটু বাগত সুরে জবাব দিল।

অনুসূয়ার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল বিকাশের জবাবে। বিকাশের মধ্যে গাম্ভীর্য আছে রূঢ়তা নেই, আবেগ আছে উচ্ছ্বাস নেই, সংযম আছে আত্মপ্রবঞ্চনা নেই। অনুসূয়া কথা না বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হৃদয়াবেগ সংবরণ করে নিল।

বিকাশ উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দায় পায়চারী করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। সারা দুপুর বাড়ী এলোনা। সন্ধ্যার অন্ধকারে এসে ঢুকল নিজের কামরায়। অনুসূয়া বসেছিল জানলার ধারে। আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। শুকনো উস্কো খুস্কো চুল, মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখে কেমন একটা আত্মপীড়নের ছাপ বিকাশের। অনুসূয়া ছুটে এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

উদ্বেগাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় ছিলে সারা দিন? ভেবে ভেবে আমরা তো অস্থির।'

'যেখানে খুশী সেখানে। তুমি আমার অভিভাবিকা নও যে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।' বিকাশ নীরস কণ্ঠে দৃঢ়ভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে মুখ ফিরিয়ে কোটের বোতাম খুলতে লাগল।

অভিমানে অবমাননায় অনুসূয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় সুরু হয়ে যায়। চোখে জল এসে পড়ে।

'কৈফিয়ৎ আমি চাইনি ক্যাপ্টেন। কৈফিয়ৎ চাইবার ধৃষ্টতা আমার নেই...কিন্তু তুমিও আমাকে ঘৃণা...।' ছুটতে ছুটতে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

ছোটেলাল কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিকাশ তার দিকে তাকিয়ে হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, ‘তবলা লাও। আজ বাজাবো আমি।’

ছোটেলাল বলল, ‘আনছি, কিন্তু মেমসাহেব সকাল থেকে না খেয়ে আছেন।’

‘কেন?’ —বিকাশ ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকালো।

‘আপনার অপেক্ষায়।’

‘তুমি একটি আস্ত হাতী।’ —বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল, ‘জোর করে খাওয়াতে পারলে না। জানো ও অসুস্থ।’

‘অনেক বলেছি, না খেলে কি করব বলুন। সারাদিন আপনার জন্য যে রকম ছটফট করেছেন। পরশু চলে যাবেন কিনা তাই ওনার মন খারাপ লাগছিল।’

বিকাশের চোখে ভেসে উঠল, একটু আগে ওর কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা। ওকে কেন আঘাত দিল সে? আর সারাদিন কেনই বা সে রাগ করে বাইরে বাইরে কাটালো? নিজের মাথার মধ্যেই তো গোলমাল ঢুকেছে।

‘আচ্ছা যাও আমি দেখছি।’ —ছোটেলালকে বিদায় দিল বিকাশ।

অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে দেখল জানলার কাছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে মুখের মধ্যে সাড়ী গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে অনুসূয়া।

'অনুসূয়া.......'

অনুসূয়া চমকে উঠল।

বিকাশ দাঁড়ালো ওর পেছনে এসে।

'সারাদিন খাওনি কেন?'—মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করল।

'আমার ইচ্ছে, আমার খুশী···তুমিও আমার অভিভাবক নও।'

বিকাশ রাগল না। আরও একটু হেসে বলল, 'সেইটাই তো বিপদ হয়েছে অনুসূয়া। অভিভাবক হলে কড়া শাসনে রাখতাম। যা ইচ্ছে তাই করতে দিতাম না।'

'কি আমি করেছি?'

'নিজেই বুঝে দেখ। এখন এস এ ঘরে খেয়ে নেওয়া যাক।' বিকাশ ওর হাত ধরে টানল।

অনুসূয়া বাধা দিয়ে বলল, 'ক্ষিধে নেই, খাবোনা।'

'ছেলেমানুষী করোনা; আমি তোমার অভিভাবক নই এই ধারণাটা ভুল।' —খুব গম্ভীর ভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে কথা গুলো উচ্চারণ করে সে গায়ের জোরেই ওকে টানতে টানতে পাশের কামরায় নিয়ে এল।

'তুমি আমায় মারবে নাকি?'

বিকাশ ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হেসে ওকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে ওর সামনে টেবিলের উপর বসল। হঠাৎ চিরুণি তুলে নিয়ে বাঁ হাতে ওর চিবুক ধরে চুল আচড়াতে

আবম্ভ কবল। অনুসূয়া বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। অপ্রত্যাশিত আচরণ।

সোহাগ ভরা কণ্ঠে বিকাশ বলল, 'চুল আচড়াওনি কেন সারাদিন? কয়দিনে কি বিশ্রী বোগা হয়ে গেছ।'

অনুসূয়া চোখ বুজল। বিকাশেব দিকে তাকাবার সাহস নেই তাব।

'ওকি, তাকাও আমাব দিকে।'

অনুসূয়া অনেক কষ্টে তাকালো চোখ তুলে।

বিকাশ ওব কপালে কুমকুমের টিপ দিয়ে দিল একটা।

'এ কি সাড়ী পরেছ? যাও লাল সিল্কটা পরে এস, আব মেখে এস তোমাব সেই সুগন্ধি।'

অনুসূয়া লজ্জানত মুখে পাশেব ঘবে চলে গেল। পনেব মিনিট বাদে দবজায় ধাক্কা দিল বিকাশ, 'হয়েছে?'

'না না, প্লীজ।'

আবও পনের মিনিট বাদে বিকাশ ভেজান দবজা ধাক্কা মেবে খুলল। সেজেগুজে পাথবেব মূর্তিব মত স্তব্ধ হয়ে অনুসূয়া দাঁড়িয়ে আছে ঘবেব মাঝখানে।

'চমৎকাব···চমৎকাব· এই সাড়ীটায় তোমার সৌন্দর্য হাজাব গুণ বেড়ে যায়, কিন্তু ত্রুটি আছে এখনও। ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক কই? এস কাছে এস।'

অনুসূয়া ধীর পদে এগিয়ে গেল। ঘরেব আলোয় তার মসৃন গাল দুটো চিকচিক করে উঠল। অশ্রুর দাগ।

'কাঁদছিলে তুমি ? কেন ?'

অনুসূয়া কান্নার সুরে বলল, 'এ আমার সাজেনা, সাজেনা। আমি অশুচি, পতিত, অপবিত্র।

'ওকথা সত্যি নয়। আমি তোমাকে শিশিরের মত পবিত্র এবং ফুলের মত শুচি বলে মনে করি।'

'ও হল আমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা। আমাকে ভালবাস ···তাই···।'

'ঠিক ধরেছ।' —বিকাশ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি তোমাকে ভালোই বাসি। সে যে তুমিও অনুভব করছ সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।'

অনুসূয়ার সারা দেহে শিহরণ বয়ে গেল। অসতর্ক মুহূর্তে এ কি কথা বলে ফেলল সে ?

বিকাশ ওর হাত দুটো মুঠোয় তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'নো···নো···নো···।' —অস্থির ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিকাশের হাত ছাড়িয়ে অনুসূয়া লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের উপর। তার চোখের জলে ভেসে উঠল বিকাশের পায়ের পাতা।

পরদিন ভোরে ডিউটি দিতে যাবার আগে বিকাশ দুপুরের খাবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে বলে গেল ছোটেলালকে।

বাড়ী ফিরল সন্ধ্যা ঘুরে গেলে। অনুসূয়া কাপড় ভাজ করে রাখছিল সুটকেসে। কাল তার যাত্রার দিন, দুপুরেই ট্রেন।

বিকাশ সোজা এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'অনেক ভেবে দেখেছি অনুসূয়া, কাল তোমার যাওয়া হতে পারেনা কিছুতেই।'

অনুসূয়া উঠে দাঁড়াল ওর মুখোমুখি। বিকাশের হাভভাব, কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে স্বাভাবিকতা নেই বিন্দুমাত্র। সে বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে তার শানিত দৃষ্টিতে বোঝা গেল।

অনুসূয়ার মুখ দিয়ে কথা সরল না। ওর দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল।

'যেতে পারবে না তুমি। আমি তোমাকে যেতে দেবোনা।'

'কিন্তু' —অনুসূয়ার কণ্ঠে ভীতি।

'কোনও 'কিন্তু' শোনবার স্পৃহা নেই। এ আমার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত।' —বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত ছেলে মানুষের মত সুটকেস থেকে ভাজ করা কাপড় গুলো টেনে টেনে আলনার দিক ছুঁড়ে দিতে লাগল।

অনুসূয়া ওর হাত চেপে ধবল, 'কি করচ তুমি বুঝতে পাবছ না বিকাশ। আমাব উপর তোমার কোন মোহ থাকা উচিত নয়। তাতে তুমিই ছোট হয়ে উঠবে সকলের কাছে।'

'নিজের ভাল মন্দ বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। তোমার কাছে ধার চাইবার প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু আমাকে যে অপরাধী করবে সারা জীবনের মত। তোমার অনুগ্রহের মূল্য দেব এমন তো কোন ধন আমাব আর নেই।'

বিকাশ বলল, 'সে তোমার ভ্রান্ত ধারণা। মনের শুচিতা হচ্ছে শুভবুদ্ধি নিষ্ঠা এবং কল্যাণবোধ আর দেহেব পবিত্রতা হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। ভালবাসার মর্যাদা রাখতে তুমি যা করেছ তাতেই তোমার সতীত্বের চরম পরীক্ষা হয়ে গেছে। তুমি এখন অগ্নিশুদ্ধ।'

বিকাশ আবেগ-থরো-থরো অনুসূয়াকে কাছে টেনে নিল। অনুসূয়া বাধা দিলনা।

'কিন্তু একদিন মনে গ্লানি আসবে। আমার বিশ্বাসের মূল কেঁপে গেছে। মানুষের মন…'

অনুসূয়া মুখ তুলে তাকালো বিকাশের মুখের দিকে। তার চোখে জল ভরে উঠেছে। বিকাশ মুখ হেট কোরে তার সজল চোখে চুমু খেল, চুলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ওর দেহের স্পন্দন অনুভব করতে লাগল নিজের মধ্যে। ঘাড়ের উপর ওর তপ্ত নিঃশ্বাসে উষ্ণ কামনার সঞ্চরণশীলতা। বিকাশের চোখে আনন্দাশ্রু, তাতে অনুসূয়ার সুগন্ধ চুল ভিজে উঠছে।

'তুমি আমার অনুসূয়া, তুমি আমার। তোমার দেহ, তোমার মন, তোমার আনন্দ বেদনা সব আমার—সব আমার।'

রাত্রির স্তব্ধতায় সমাহিত হয়ে রইল ঘরের আবহাওয়া। কোন কথা নেই, শুধু হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে পরস্পরকে অনুভব করার নিবিড় আবেগে থরো থরো দুটি মানুষ। চোখের

জলের কঠিন বাঁধনে বাঁধা পড়েছে তারা, অবিচ্ছেদ্য যেন সেই বন্ধন।

'আমি আমার ছোট ভাইকে টেলিগ্রাম করেছি, দুই এক দিনের মধ্যেই সে এসে পড়বে। তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব।' বিকাশ চুপি চুপি বলল ওর কানে।

'কার কাছে পাঠাবে?'—-অনুসূয়া চোখ বুজেই প্রশ্ন করে।

'ভাই বোনের কাছে। ওদের কাছে কিছু দিন থেকে শরীর সেরে গেলে আবার ফিরে এস এখানে।'

'তাঁরা আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন তো?'

'নিশ্চয়ই পারবে। দুজনেই রাজনীতি করে, কোন কুসংস্কার নেই। তাঁদের সঙ্গে থাকলে তুমি খুব খুশীই হবে। যথেষ্ট সমাদরেই তারা তোমাকে গ্রহণ করবে।'

বসন্তকালে শুকনো পাতা ঝরার সময় আবার ফিরে এলো অনুসূয়া। সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। বাঙলা গান শিখেছে, কথাও শিখেছে দুই একটা। সব সময় হাসিখুশী ঠাট্টা-তামাসায় মসগুল। বলে, 'হো মোশাই, দেখুন কেমুন বাঙলা বোলী শিখিয়েছি।' একটা মোটা দেওয়ালকে মাঝখানে রেখে দুজনকে এখন আর দুঘরে কাটাতে হয় না। রেজিষ্ট্রার তাদের মিলনের পরোয়ানা সই করে দিয়েছেন। বিকাশকে মাঝে মাঝে জ্বালিয়ে তোলে অনুসূয়া, বলে,

'কলকাতায় গিয়ে থাকবো। এই মরুভূমির দেশে একা একা বাস করা যায় নাকি?' বিকাশ বলে, 'বেশত চলে যাও আবার।'

অনুসূয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'তুমি তো আর যাবে না।'

'নাইবা গেলাম। আরও তো অনেক লোক আছে সেখানে।'

অনুসূয়া সজল চোখে অসহায়ের মত তাকায় বিকাশের দিকে। বিকাশ ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় সস্নেহে।

'তুমি এই মিলিটারী পোষাকটা ছাড়তে পারো না? আমার একটুও ভাল লাগে না ওটা। একটা অশুভ প্রতীক বলে মনে হয়। এ রাজগীর চেয়ে দারিদ্র্যও অনেক ভাল। ভয়কি, আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমার গহনা টাকা সব নিয়ে তু'তিন হাজাব টাকা হবে। তাছাড়া চাকরী করেও তো টাকা উপায় করতে পারি। চল, এই চাকরী ছেড়ে দিয়ে তুজনে আমরা চলে যাই কলকাতায়।'

বিকাশ ম্লান হেসে বলে, 'তা হয় না অনুসূয়া। মিলিটারীতে ঢুকলে বেরুনো খুব শক্ত আর যুদ্ধের সময়ে অসম্ভব। যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত আমাকে এই অবাঞ্ছনীয় চাকরীতে বহাল থাকতেই হবে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ফিল্ড সার্ভিসেও যেতে হতে পারে।'

অনুসূয়া শিউরে উঠে বিকাশকে জড়িয়ে ধরে বলে,

'না না ফিল্ড সার্ভিসে নয়। আমাকে আর দুঃস্বপ্ন দেখিও না। অনেক হয়নি কি ?'

বিকাশ ঠাট্টা করে বলে, 'তোমার ঈশ্বরকে প্রশ্ন কোরো।'

অনুসূয়া বলে, 'আমাব ঈশ্বর আমাকে সমস্ত সঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন। দেখো তিনি তোমাকে কখনও ফিল্ড সার্ভিসে পাঠাবেন না। আমি যে প্রতিদিন তার পূজা করি মনে মনে। তাঁর অনুগ্রহ না থাকলে তোমাকে পেতাম কি করে ?'

এতই ছেলেমানুষী যুক্তি যে বিকাশ জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। ভাবে, খোসলাকেও কি ওব ভগবানই জুটিয়ে দেয় নি ?

বিকাশেব সঙ্গে বেড়াতে বেরোয় অনুসূয়া। চৌবেব বাড়ী গিয়ে সমাজতত্ত্ব আলোচনা কবে। বোম্বাইতে সে সমাজতত্ত্বের ছাত্রী ছিল। চৌবে একটু সঙ্কোচ বোধ কবেন, বলেন, 'আমি তোমায় বুঝতে পারিনি মা। মজুমদারেব কাছে সব শুনে এবং তোমার সঙ্গে আলাপ করে তোমার সম্বন্ধে অনেক খারাপ ধারণা আমার কেটে গেছে। ভারী খুশী হয়েছি তোমাদের বিবাহে। মজুমদার তোমার যোগ্য স্বামী।'

'আপনি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।'—অনুসূয়া মাথা হেট করে।

মিসেস চৌবে অনুসূয়াকে সোনার হার উপহার দিয়েছেন।

অনুসূয়া তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে প্রথম সাক্ষাতেই একেবারে পরমাত্মীয়া হয়ে উঠেছে।

ক্যাণ্টনমেণ্টের সীমাবদ্ধ জীবনের ছোট্ট সমাজে তারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুধু পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের কোয়ার্টার মাষ্টার মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেন, 'কি হে নিজের বউকে বেমালুম বন্ধুর ফিঁয়াসে বলে চালিয়ে দিলে? নিজের বউকে অন্যের ফিঁয়াসে ভেবে মনে মনে একটু রোমাঞ্চ অনুভব করার পরিকল্পনাটা বেশ।' বিকাশ হাসে। ওরা কেউই জানেনা আসল ঘটনাটা।

কোন কোন নির্জন দুপুরে একা থাকতে থাকতে অনুসূয়া হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়ে। ফেলে আসা জীবনের স্মৃতির জঞ্জাল তার দম বন্ধ করে দিতে চায়। জীবনের চাকা তার ঘুরছে, কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে—জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত। মহারাষ্ট্রের মেয়ে সে, বাঙলার বধূ হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে খোসলার অধ্যায়টা বড় কালো, বড় মিথ্যা ছলনায় ভরা। বিকাশ তাকে ভালবাসে খুবই কিন্তু যদি সে নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ হত তাহলে কি আরও অনেক বেশী ভালবাসা আদায় করতে পারত না বিকাশের কাছ থেকে? এখন তো বিকাশের কাছে সে সব সময়ই সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ওর হাতে সমর্পণ করলেও সেটা

নিজের কাছেই অনেক সময় প্রবঞ্চনার মত লাগে। বিকাশের ফোটোর সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে অনুসূয়া। হিন্দু শাস্ত্রে বলেছে নারীর দেবতা হচ্ছে তার পতি।

অনুসূয়া ভাবে, এবার যখন বিকাশ তাকে ভগবান নিয়ে ঠাট্টা করবে, তখন সে বলবে, 'ওগো মশাই, আপনি আমার দেবতাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, কিন্তু সেটা যে লাগছে আপনারই গায়ে। আপনিই তো আমার ভগবান।'

কিন্তু বিকাশ রোজ ঠাট্টা করে না। অনুসূয়ার কলকাতায় যাবার আগে তার মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল তা স্তিমিত হয়েছে। আগের চেয়ে অনেক বেশী গম্ভীর দেখায় তাকে। মাঝে মাঝে অনুসূয়ার ভয় ধরে যায়, কিন্তু একটু কথাবার্তা বললেই বুঝতে পারে ওর গাম্ভীর্যের মধ্যে কোন বিরক্তি বা বিরাগ নেই, ওইটাই ওর স্বভাব।

অনুসূয়া কিছু বলতে গিয়ে হয়ত দেখে বিকাশ আর্মি অর্ডারের পাতা ওল্টাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকে সে চুপ করে। অনেকক্ষণ বাদে বিকাশের নজর পড়লে ডাকে, 'কি হলো, চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে?'

'দেখছিলাম, কতক্ষণ তুমি আমায় দাঁড় করিয়ে রাখ।'— অনুযোগের সুরে বলে অনুসূয়া।

বিকাশ ওকে কাছে বসিয়ে আদর করে। অনুসূয়ার সমস্ত ভয় সন্দেহ মুহূর্তেই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ তো আর পুথিগত ভালবাসা নয়, এখানে প্রতি মুহূর্তে

ভালবাসার পরীক্ষা চলছে পারস্পরিক সাহচর্যে। ফাঁকির উপায় নেই।

'কি ভাব সারাক্ষণ? গম্ভীর হয়ে থাক, আমার ভয় লাগে।'

বিকাশ বলে, 'এই বিচ্ছিন্ন জীবন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, যুদ্ধটা থামলে বাঁচি।'

'কি করবে তারপর?'

'সে তো তোমাকে আগেই বলেছি। বাঙলার কোন মফঃস্বল সহরে গিয়ে প্র্যাকটিস করব।'

'আর আমি?'—অনুসূয়া চুপি-চুপি প্রশ্ন করে।

'তুমি? তুমিও থাকবে আমার সঙ্গে। কেন আপত্তি আছে নাকি ' বিকাশ ঠাট্টার সুরে বলে।

অনুসূয়া ওর কোলে মুখ লুকোয়। ছেলেবেলায় মায়ের মৃত্যু এবং বাবার দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের পর থেকে এমন একান্ত আদর তার ভাগ্যে বেশী জোটেনি। পিসিমার বাসায় পিসতুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে এক রকম অনাদরেই মানুষ হয়েছে সে। নিজের স্বভাবের গুণে অনেকের স্নেহ এবং অনুগ্রহ লাভ করেছে বটে, তবে বিকাশের মত এমন একান্তভাবে কেউ তাকে বুকে তুলে নেয়নি কখনও। খোসলার কথা সে ধরেনা, কারণ সে তো একেবারেই মিথ্যা। অনুসূয়া যখন অনুভব করে বিকাশের বুকের অনেকখানি সে জুড়ে বসেছে তখনই তার মনে দুঃখবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। মনে হয়, প্রতিদানে বিকাশকে

সে কতটুকু দেয় ? সেবায়, সাহচর্যে, ভালবাসায় বিকাশকে ভাসিয়ে না দিতে পারলে তার শান্তি নেই। আগ্রহাতিশয্যে দুপুরে সে বিকাশের জুতোর ফিতে খুলে দিতে চায়, রাত্রে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে চায়, কিন্তু বিকাশ ওসব একদম পছন্দ করে না। সেবা করবার কোন সুযোগই সে অনুসূয়াকে দেয় না, বরং উল্টো অনুসূয়ার সামান্য একটু অসুবিধা হলেই একেবারে বিব্রত হয়ে ওঠে। বাথরুমে পা পিছলে হাটুতে চোট খেয়েছিল অনুসূয়া। উঃ আঃ আওয়াজ শুনেই ওকে বাথরুম থেকে দুই হাতে তুলে এনেছে বিকাশ। তাড়াতাড়ি কিছু না হবার ভান করে ছুটে পালাতে গিয়েছিল অনুসূয়া, বিকাশ চেপে রেখেছে। বাধ্য হয়ে পা দুখানা বিকাশের হাতে ছেড়ে দিয়ে লজ্জায় ও যখন চোখ বুজে ছিল তখন বিকাশ ওর উপর শুধু ডাক্তারীই করেনি, কাব্যও করেছে। ওর পা দুটো যে এত সুন্দর তা নাকি জানতো না সে। পায়ের পাতার উপর বিকাশের ওষ্ঠাধরের তপ্ত স্পর্শ অনুসূয়ার দেহ অবশ করে ফেলেছিল। চোখ ছাপিয়ে নেমেছিল জলের ধারা।

'কেন আমাকে পাপী করলে ?'—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অনুনয়ের সুর করে প্রশ্ন করেছিল অনুসূয়া।

'পাপ' ?—বিকাশ হেসেছিল, 'প্রতিদিন আমি চুমু খাব তোমার দুটি পায়ে। তুমি আমার—চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। বুঝলে ! ও আমার অধিকার।'

অনুসূয়া জানে সত্যিই ও প্রতিদিন ওর পা নিয়ে টানা-টানি করবে না, তবুও এরকম ধর্মবিরুদ্ধ কাজে সায় দিতে সে অন্তরের বাধা অনুভব করে।

'বেশ তুমি যা করার করেছ, এবার আমাকে আমার কর্তব্য করতে দাও।'

'কত   কি ?'

'দেখই   '—বলেই সে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে বিকাশের পা দুটো জড়িয়ে ধরে মাথা ঠেকায়—প্রণাম করে।

বিকাশ ওকে গায়ের জোরে তুলে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেয়।

ঈশ্বরে যার ভয় নেই, সে কি করে এত ন্যায় নীতির পথে চলে একথা ভেবে মাঝে মাঝে অনুসূয়ার বিস্ময় লাগে।

বসন্তটা কাটল তাদের বেশ শান্তিতেই। গ্রীষ্মের সুরুতেই আম্বালায় লু উড়তে আরম্ভ করল। তখন সূর্য ডোবে অনেক দেরীতে আর ওঠে অনেক আগে। বেড়াবার দারুণ অবসর, কিন্তু রোদ না পড়লে বাইরে বেরুনো অসম্ভব।

'সারাদিন একা একা সময় কাটতে চায় না। ভাবছি এম-এ পরীক্ষা দেব।'—অনুসূয়া প্রস্তাব করে।

'বেশ ত, চমৎকার হবে। তার আগে তুমি তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে এসো না কেন। তাঁর কাছ থেকে আর তো আত্মগোপন করে থাকবার প্রয়োজন নেই।'

অনুসূয়ার মুখটা মলিন হয়ে যায় মুহূর্তেই। বিবাহের আগে এবং পরে বহুবার এ নিয়ে মনে মনে অনেক ভেবেছে সে। সেকেন্দ্রাবাদ অথবা শোলাপুর যেখানেই সে যাবে এখন, সেখানেই কাণা-ঘুষো এবং হাসাহাসি হবে তার বিবাহের পাত্র বদলের ব্যাপার নিয়ে। তাই সে আপাতত ওসব এড়াতে চায়।

'কি? চুপ করে রইলে যে? ইচ্ছে নেই বুঝি?'—বিকাশ হাসতে হাসতে ওর পিঠ চাপড়ায়।

'বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব তবে আজ নয়। স্বামী-পুত্রেব সঙ্গে যাব······' অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অস্ফুটে জবাব দেয় অনুসূয়া।

বিকাশ হো হো কবে হেসে ওকে আবও লজ্জায় ফেলে।

'তোমার সন্তান-বাৎসল্যের বহর দেখে ভয় হয়, মা হলে তুমি আর আমায় আমল দেবে না। বাবা হয়ে যদি তোমাকে হারাতে হয়, তাহলে কিন্তু বাবা হতে আমার বিন্দুমাত্র সাধ নেই।'—বিকাশ ওর কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেয়।

অনুসূয়া ধমকের সুরে বলে, 'কি বলছ যা তা। ওসব কথা থাক এখন। বল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ধরব।'

'কলকাতারই ধর। শেষ পর্যন্ত ওখানেই যখন থাকতে হবে।'

শরতের শেষে পৃথিবীব্যাপী ভারতীয় ফৌজের নূতন পুনর্বিন্যাস সুরু হল। রণাঙ্গনের ক্লান্ত সৈনিকদের ফিরিয়ে এনে সেখানে নতুন ফৌজ পাঠাবার আয়োজন হতে লাগল। চৌবে একদিন বিকাশকে ডেকে বললেন, 'তৈরী হও মজুমদার, তোমার ডাক এসেছে। আই এ্যাম রিয়েলি সরি।'

কম্পিত হৃদয়ে বিকাশ দেখল তার পরোয়ানা। অপ্রত্যাশিত নয়, তবুও তার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

অনুসূয়া প্রথমটায় ভেবেছিল ঠাট্টা, শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলল: 'আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি এই যুদ্ধই আমার কাল। এ আমাকে নরকের দ্বার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে।'

অশ্রুময়ী অনুসূয়া বিকাশকে আরও দমিয়ে দেয়। ওকে হঠাৎ বড়ো অসহায় বলে মনে হয় বিকাশের। সে যদি মারা যায় রণাঙ্গনে, তাহলে অনুসূয়ার অবস্থাটা দাঁড়াবে নোঙর-হীন্ নৌকার মত। অনুসূয়াকে বুকে তুলে নিয়ে সে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, কিন্তু ঠাট্টা-তামাসা করে হাল্কা আবহাওয়া সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করে না।

'এত উতলা হয়ো না অনুসূয়া। আমরা ডাক্তার, রণাঙ্গনের অনেক পেছনে থাকব, কাজেই ভয় পাবার বিশেষ কিছু নেই। তুমি কলকাতায় গিয়ে ভর্তি হও এম-এ ক্লাসে। দেখতে দেখতে ফিরে এসে আবার মিলব তোমার সঙ্গে কলকাতায়।'

রণাঙ্গনে যাত্রার আগে পনোবো দিন ছুটি। আম্বালার পাট উঠিয়ে তারা যাত্রা করল কলকাতায়। ট্রেনে একটা আলাদা কামরা পেয়েছে চেষ্টা করে। গাড়ীর মধ্যে অনুসূয়া বলল, 'ভারী মন খারাপ লাগছে ছোটেলাল আর লছমনিয়ার জন্যে।'

'খুবই স্বাভাবিক। লছমনিয়া তোমায় খুব ভালবাসত।'

হঠাৎ অনুসূয়ার মুখে লজ্জার ছোপ পড়ে।

'জানো, লছমনি বলছিল আমি নাকি.........'কথাটা শেষ করার আগে বিকাশের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাথা নত করল অনুসূয়া।

'জানি।'--বিকাশের মুখে হাসি ফোটে।

অনুসূয়া চমকে মুখ তুলে তাকায় বিস্ময়েব দৃষ্টিতে, 'কি কবে জানলে ?'

'আমি একজন ডাক্তার, সে কথাটা ভুললে চলবে কেন ?' বিকাশ ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। অনুসূয়া তার চুলে বিলি কেটে দেয়।

'ও' আসবার আগেই তুমি চলে আসবে তো ?' মৃদু কোমল স্বরে প্রশ্ন করে অনুসূয়া।

'আশা হয় না। অন্তত এক বছর বাইরে না রেখে ছাড়বে না। তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি তো

জানো তোমার ননদ এবং দেবর দুজনেই খুব করিৎকর্মা লোক। ওরা তোমার এতটুকু অসুবিধা হতে দেবে না।'

বিকাশের ঠোঁটের উপর এক ফোঁটা তপ্ত লোনা জল পড়ে।

'তুমি কিন্তু ছিচকাঁদুনে হয়ে উঠছ ক্রমশঃ।'

'তুমি তো বুঝবে না আমার মনের অবস্থা। তুমি তো কখনও আমার অবস্থায় পড়নি। ক'মাস আগে আমি যে নিদারুণ সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম, আবার পিছু হটে সেখানেই গিয়ে পড়লাম। তোমার অজ্ঞাতযাত্রা আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। এই যুদ্ধ আমার ভাগ্যকে নিয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস করছে।'

'তোমার ভগবান?' বলেই বিকাশ মুচকি হেসে দুই হাতে অনুসূয়ার কোমর জড়িয়ে মুখ লুকোয় ওর কোলে। অনুসূয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় সস্নেহে।

'ঈশ্বরকে আমি ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছি। তাঁর কোন অধিকার নেই আমাকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবার।'

বিকাশ হাসে হো হো করে। বলে, 'অশরীরী ঈশ্বর নয় অনুসূয়া, পৃথিবীর মুনাফা বাটোয়ারার নেশায় মত্ত মানুষ-ঈশ্বর। আমাদের দারিদ্র্য আর অভাবের সুযোগে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়েছে ওরা। নইলে দেখ, এই যুদ্ধে আমার তো কোন স্বার্থ নেই, তবু অবস্থার চাপে লড়াইয়ের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছি। যুক্তপ্রদেশে

এবং পাঞ্জাবের গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। আঠার টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ জীবন বিকিয়ে যাচ্ছে। নিছক খেয়ে পরে বাঁচবার তাগিদে মৃত্যুর সঙ্গে তারা পাঞ্জা কসছে। আমরা ওদের হাতের পুতুল। যেভাবে চালাচ্ছে সেইভাবে চলছি। তুমিও তাদের শিকার, আমিও।'

অনুসূয়া মাঝরাতে বুঝল বিকাশ তার কোলের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে একটা আনন্দ এবং তৃপ্তি বয়ে গেল। এই মানুষটাকে জীবনে কখনও স্বপ্নেও দেখেনি সে। মাত্র ক'মাস আগে হঠাৎ ওর আবির্ভাব তার জীবনে আর আজ তার সমস্ত জীবনটাই ওকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলছে। এখন এই পৃথিবীতে ওই তার সবচেয়ে আপন জন। চলন্ত ট্রেনেব ছোট্ট কামবাটাকে নিজের পৃথিবী বলে মনে হয় অনুসূয়ার। এ পৃথিবীতে বিকাশ আব সে ছাড়া আর কেউ নেই। আব যে আছে অলক্ষ্যে, সে তাদেব দ্বৈত প্রেমেব দ্যুতিময় সৃষ্টি। ওঃ জীবনটা যদি এই চলতি ট্রেনেব কামবায়ই কেটে যেত! গর্ভে শিশু, কোলে নিশ্চিন্ত আবামে নিদ্রামগ্ন স্বামী, বাইরে উপচেপড়া জ্যোৎস্না, ভিতরে বাত্রির সুশীতল প্রশান্তি। আবেগ-বিহ্বল অনুসূয়া বাইরে তাকায় ভাবমুগ্ধ চোখে, প্রাণভবে নিঃশ্বাস নেয়। তাবপর মাথা নীচু করে আলগোছে চুমু খায় বিকাশেব মুখে। হাজার হাজাব বছব ধবে বিকাশ এমনি ঘুমোক তার কোলে মাথা রেখে। সে জেগে পাহাবা দেবে, ঘুম পাড়াবে গান গেয়ে,

চুলে বিলি কেটে দেবে, সমস্ত ক্লান্তি মুছে দেবে আঁচল দিয়ে। আর কিছু চায় না সে।

ওর সঞ্চরণশীল অধর স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেল বিকাশের।

অনুসূয়া মিনতি করে বলে, 'আর একটু ঘুমোও লক্ষ্মী।'

'কেন বলত ?'—বিকাশ শুয়ে শুয়ে হাসে।

'আমার ভীষণ ভাল লাগছে। তোমাকে পেয়েছি একেবারে নিজের বুকের মধ্যে। এ সুখ থেকে বঞ্চিত কোরোনা আমায়।' বিকাশ আবার চোখ বোজে। আবও নিবিড় হয়ে শোয় ওর উষ্ণ নবম কোলেব মধ্যে।

স্বামীব উষ্ণ সান্নিধ্য বিদায়েব অশ্রুতে শীতল হয়ে আসতে থাকে দিনের পর দিন। সারাদিন বেশ কেটে যায় মিট্রুর সঙ্গে ছুটোছুটি কবে। কিন্তু রাত্রে ঘুমন্ত মিট্রুর পাশে শুয়ে অর্ধেক রাত্রি তার কাটে জাগরণে। হাজাব রকমের দুশ্চিন্তা তার মাথার মধ্যে কিলবিল করতে থাকে। খোসলার খোঁজে যেদিন বে-পরোয়া হয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, সেদিন মনে যে দৃঢ়তা ছিল, যে জোর ছিল, যে অসীম সাহসিকতা ছিল, আজ আর কিছু অবশিষ্ট আছে বলে মনে হয় না তার। মনে হয়, জীবনের তাব এমন ভাবে আলগা হয়ে গেছে যে একমাত্র বিকাশের মত যন্ত্রী ছাড়া আর কেউ তা বাঁধতে পারবে

না স্বাভাবিক স্বরে। এখানে থাকতে তার কোনই অসুবিধা নেই, বরং আম্বালার চেয়েও এখানে সে ঢের ভাল আছে। সহরের কর্মচাঞ্চল্যেব সঙ্গে কোথায় যেন তার নাড়ীর যোগ আছে। যুদ্ধেব আঘাতে পঙ্গু কলকাতাকেও সে ভালবেসে ফেলেছে, বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষের ভালবাসা অর্জন করেছে, তবুও বিকাশের অভাবে এ বাড়ীতে নিজেকে তার অনেক সময়ই বিদেশিনী বলে মনে হয়।

'সারা রাত্রি উসখুস করো, তোমার বুঝি ঘুম হয় না বৌদি?' প্রশ্ন করে মিট্টু।

'ঘুম না হলে আর বেঁচে আছি কি কবে। আচ্ছা ভাই মিট্টু তোমবা তো মার্কসবাদী—যুদ্ধবিরোধী। তাহলে দাদাকে মিলিটারীতে যেতে দিলে কেন?'

'না হলে তোমায় পেতাম কি করে?'—কৌতুকের সুবে বলে মিট্টু।

'ওতো প্রশ্ন এড়ানো জবাব। আমি তো আকস্মিক। আমাকে না পেলে হয়ত আরও ভাল কাউকে পেতে।'

খারাপও হতে পারত! যাক সে কথা, আসল কথাটা হচ্ছে সংসারে টাকা চাই অথচ মিলিটারীতে না ঢুকলে তাড়াতাড়ি কিছু একটা করে ফেলাও অসম্ভব ছিল, তাই দাদা কাউকে গোপনে না জনিয়ে নাম লিখিয়ে এসেছিল। আমরা যুদ্ধবিরোধী ঠিকই কিন্তু আমাদের সহস্র যুদ্ধবিরোধিতা সত্ত্বেও মহাসমর বেধে উঠেছে, ঠেকাতে

পারিনি। ফ্যাসীবাদ সারা দুনিয়ার মানুষকে ক্রীতদাস বানাতে চায়। মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু এই ফ্যাসীবাদের আঘাত প্রতিহত করার দায়িত্বও সারা দুনিয়ার মানুষের। তাই মানুষ হিসাবে এই যুদ্ধে আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে, সেটা হচ্ছে ফ্যাসীবাদকে চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করা। দাদার পথ ঠিক আমাদের পথ নয়। ভারতবর্ষের মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জড়ানো হয়েছে। আমরাও এই যুদ্ধে অংশ নিতে চেয়েছিলাম, তবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ হিসাবে, স্বেচ্ছায়। ইংরাজের বেতনভুক সৈনিক হিসাবে নয়। দাদা গেছে আমাদের অমতে। একবার ঢুকলে বেরুনো প্রায় অসম্ভব, তাই আমরাও ব্যাপারটাকে সহজ করে গ্রহণ করেছি। সবাই মিলে আক্ষেপ করে বেচারার মনোবল ভাঙতে চাইনি।'

অনুসূয়া রাজনৈতিক যুক্তি তর্ক বুঝতে পারে না ঠিক মত। জীবনে কোন সুনির্দিষ্ট দর্শন নিয়ে সে কখনও চলেনি। আশা আকাঙ্ক্ষা তার মনের মধ্যে গড়ে উঠছে আপনিই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রচলিত ধারা অনুযায়ী। নিজের পথে নিজেকে চালানো বড় কঠিন—এই তার মর্মান্তিক উপলব্ধি। 'জীবনকে সহজ করতে গেলে আরও জটিল হয়ে ওঠে'—বিকাশের কথাই ঠিক। পৃথিবী চলছে এমন একটা জটিল আবর্ত পরিক্রম করে যার খেই খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন, অন্ততঃ তার মত ঘরোয়া মেয়ের পক্ষে।

'আচ্ছা বউদি, সেদিন দাদা অতবড় একটা চিঠিতে কি লিখেছে তোমায়? প্রেমপত্রের ওজনটি তো বড় কম হবে না।' —মিট্টু ঠাট্টার সুরে প্রশ্ন করে।

'সে এক বীভৎস বর্ণনা রণাঙ্গনের। শুনবে?'

অনুসূয়া ড্রয়ার খুলে তাড়াতাড়ি বার করল কয়েক পৃষ্ঠার এক চিঠি। বলল, 'কি নৃশংস অমানুষিকতা এই যুদ্ধের, শুনলে বাঁচতে সাধ হয় না। শোন,' '.. সহরের নাম ঠিকানা লেখা নিষেধ তাই কাল্পনিক নাম ব্যবহার করছি। মনে কর, আজ কয়েকদিন হল আমরা মুনচেন সহর পুনর্দখল করেছি শত্রুর হাত থেকে। শত্রু কে তাতো বুঝতেই পারছ। আমরা মিত্র, কারণ জায়গাটা আগে ছিল ইংরেজদের দখলে আর আমরা তাদের হয়ে লড়াই করছি। তবে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গ নয়। এবার নিশ্চয় বুঝছ মিত্র হিসাবে আমাদের স্বার্থ কি ভাবে জড়িয়ে আছে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। এখানকার একটি বিধ্বস্ত স্কুলকে অস্থায়ী হাসপাতাল বানানো হয়েছে। অনেক বোমাবর্ষণ এবং তীব্র লড়াইয়ের পর সহরে ঢুকে একটি গৃহও অক্ষত দেখিনি। চারিদিকে নর-নারী শিশুর গলিত ও সদ্যমৃত শব ডিঙ্গিয়ে আমরা এসে ঢুকলাম সহরের কেন্দ্র স্থলে। সহরের মেয়র বললেন, এখানে এগারো হাজার আবাসগৃহ ছিল, তার মধ্যে দখল আর পুনর্দখলের বোমাবর্ষণে সাত হাজার ধ্বংস হয়েছে। লোক মারা গেছে পাঁচ হাজার, তার

মধ্যে চার হাজারই নারী আর শিশু। এ সহর দিবারাত্র কান্নার হাহাকারে এমন থমথমে হয়ে থাকে যে অনেক সময় মনে হয় পাগল হয়ে যাব। আমাদের হাসপাতালে শুধু সৈনিকদের চিকিৎসা হয়। হাজার হাজার পঙ্গু, জখম বে-সামরিক অধিবাসীদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। মনে বড় লাগে। তাই মাঝে মাঝে আমরা কয়েকজন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে খোঁজ-খবর করে যথাসাধ্য চিকিৎসা করি, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে তো কিছুই নয়। ওদের সঙ্গে মেলা-মেশার ফলে কিছুটা প্রীতির সম্পর্কও গড়ে উঠেছে। ওদের মুখে হাসি নেই। এই যুদ্ধে ওদের প্রত্যেকটি লোকই কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কার পাপে ওদের এত শাস্তি দিচ্ছেন ভগবান (তোমার ভগবানের খবর কি ?) তা ওরা আজও বুঝতে পারছে না। ইংল্যাণ্ড কোথায় আর টোকিও কোথায় তা ওদের একেবারে জ্ঞানের বাইরে। 'শত্রু'পক্ষের সৈন্যরা ওদের উপর কি বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছে তাই শোনায় আমাদের কান্নাকাটি করে। সে এত অমানুষিক কাহিনী অনুসূয়া, শুনলে তোমার ঘৃণা ধরে যাবে পৃথিবীর উপর। এক বান জেন (নামটা কিন্তু কাল্পনিক) নামে ষোল বছরের একটি মেয়ে বলল, তার মা এবং বাবাকে গ্রেপ্তার করে সমস্ত সহরবাসীর চোখের সামনে তাদের মুণ্ডু কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে বিদেশী সৈন্যরা। সেই দৃশ্য দেখে একটি

দুগ্ধপোষ্য শিশু কেঁদে ফেললে তাকে বেয়নেটের খোঁচায় খতম করা হয়। এক পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট ঘরে তিন শত নারীকে আটকে রেখে শিশু-সন্তান সহ তাদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। সেদিন সেই সমাধিস্থল দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে এখন শকুনির মহোৎসব চলছে। কিম ইয়েন স্নুন নামে বাইশ বছরের একটি মেয়ে বলল, তাদের পাড়ায় সৈন্যরা স্থানীয় অধিবাসীদের নাকের মধ্যে গরম লোহা ঢুকিয়ে প্যারেড করিয়ে নিয়ে যায় বন্দীশিবিরে। তারপর সেখানে তাদের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিম চুন জা নামে বিশ বৎসরের একটি মেয়ের কানের মধ্যে পেরেক ঠুকে তার সঙ্গে একটা জয়ঢাক বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তার পিঠে। তাকে উলঙ্গ করে সেই জয়ঢাক বাজাতে বাজাতে সমস্ত সহর পরিক্রম করে তারা। পরে তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে সে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেয়। তখন তাকে বেয়নেট খুঁচিয়ে মারা হয়। সৈন্যরা সহরের সমস্ত মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বেশ্যালয় খুলেছিল। সহর ছেড়ে যাবার সময় তারা সেই মেয়েদের এক সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। কোনক্রমে তাদের মধ্যে বেঁচে আছে তিন জন। তারই একজনের কাছে শুনলাম এ কাহিনী। মানুষ মারাটা তাদের কাছে একটা স্পোর্টস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোক ধরে এনে তাদের মুখের মধ্যে কার্তুজ ফাটিয়ে, কুঠারাঘাতে মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে এবং জীবন্ত সমাধি দিয়ে খুব মজা অনুভব

করত তারা। বলো ত, রোজ এর চেয়ে আরও হাজার গুণ ভয়াবহ কুৎসিৎ এবং পাশবিক সমস্ত কাহিনী শুনতে শুনতে মনের অবস্থা কি দাঁড়ায়!

'তবু তোমার কথা ভাবলে মাঝে মাঝে একটু তৃপ্তি পাই। তোমার সৌভাগ্য, যুদ্ধেব এ অভিজ্ঞতা তোমার পেতে হল না। কামনা করি যেন পেতে না হয়। আমার জন্য একটুও ভেবো না। আমি শারীরিক বেশ ভাল আছি। তুমি খুব সাবধানে থেকো। বাচ্চুর খবর……'

অনুসূয়া বাকী অংশটা না পড়েই চিঠিটা ভাজ করে অভিভূত মিন্টুর দিকে তাকায়।

'এ খবর নতুন কিছু নয় বউদি, তবু দাদার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলেই এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। আমাদেব বাঙলা দেশেও ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেল গত বছর মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষে। জানি না এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে, তবে এই যুদ্ধই যেন পৃথিবীর শেষ মহাযুদ্ধ হয়। মুনাফাবাজ, যুদ্ধবাজ মানুষের শত্রুদের এই যুদ্ধেই খতম করে না ফেলতে পারলে এর আরও মারাত্মক এবং ভয়াবহ পুনরাবৃত্তি ঘটবে অদূর ভবিষ্যতেই। আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু যুদ্ধ যখন বেঁধেই গেছে, তখন আমরা যুদ্ধের নায়কদের দাসত্ব করতে প্রস্তুত নই। কিন্তু বউদি, তুমি ওসব ভেবে মন খারাপ কোরো না। সব মানুষের জীবনেই বিপদ-আপদ অঘটন আছে। সে সবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ভয় করলে তারাই

চেপে বসে মনের উপর। তুমি আমাদের বউদি—এ সংসারের কর্ত্রী—সব সময় যদি নিজের দুঃখ বেদনা নিয়েই ব্যস্ত থাক তাহলে আমাদেব দেখা-শোনা করে কে বলোত। দাওনা আমার চুলটা একটু কায়দা করে। তারপর চলো বেড়িয়ে আসি বিকেলে।'

অনুসূয়া একটু লজ্জা পায়। সংসারেব কর্ত্রীত্বেব স্বীকৃতি তার মনে আনন্দের পরশ বুলিয়ে দেয়।

পিসিমা রান্নাঘরের বাইরে একপাও নড়তে রাজী নন। বাকী যারা তারা সবাই সম্পর্কে ছোট এবং এত খেয়ালী যে সংসাবের কর্ত্রীত্ব আপনিই এসে পড়ে তার ঘাড়ে। কাজটা তাব ভালও লাগে। সকালে চায়েব পালা থেকে সুরু কবে বাত্রে শোয়া পর্যন্ত সব কিছু তদ্বিব-তদারক করা, কাউকে পরামর্শ, কাউকে ধমক এবং কাউকে উপদেশ দেওয়া —এ সব কাজ তাব মনটাকে অনেক ভাবমুক্ত বাখে।

হেমন্তেব এক স্নিগ্ধ সকালে উৎসব-মুখব হয়ে উঠল এ বাড়ী। ভাবী জননীর অভিষেক।

অনুসূয়া জানে তার মাতৃত্বকে সকলের চোখে শ্রদ্ধেয় এবং মহান করে তোলাই এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মিট্টু তাকে গত রাত্রেই বুঝিয়ে দিয়েছে এর তাৎপর্য। অবশ্য মহারাষ্ট্রেও এমন একটা অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। লজ্জা এবং আনন্দের শিহরণে রোমাঞ্চিত হলেও অনুসূয়া খুব একটা

উৎসাহ পাচ্ছিল না। গত কুড়ি দিন বিকাশের কোন চিঠি সে পায়নি।

‘তোমার কি খেতে সাধ যায় বউদি? পিসিমা তোমায় সাধ মিটিয়ে খাওয়াতে চান।’

মিট্টুর প্রশ্নের জবাবে ম্লান হেসে বলল, ‘সাধ মিটিয়ে রোজই তো খাচ্ছি। সাধ-আহ্লাদের সময়টা শুধু মনে কষ্ট দিচ্ছে। জানো, অনেক দিন তোমার দাদার খবর পাইনি।’

‘অন্যদিন ওসব ভেবো বউদি। আমি বুঝি কোথায় তোমার বাজে। কিন্তু সে কষ্ট তোমার চেয়ে আমাদেরও কিছু কম নয়। তবু আজকের এই শুভ দিনটায় হাসি-খুশী হয়ে থাক। আজকের অনুষ্ঠানে তুমিই যে নায়িকা। একটা গান শোনাও না বউদি? তোমার মুখে বাঙলা গান শুনতে আমার ভারী মজা লাগে।’

এস্রাজ নিয়ে বসল অনুসূয়া। কি গান গাইবে? সব বাঙলা গানের মানে বোঝে না সে, শুধু শব্দের উচ্চারণ মুখস্ত করেছে মাত্র। তবুও তার স্থর মিষ্টি বলে বাঙলা গানও তার গলায় ভালই শোনায়।

সে গাইতে আরম্ভ করে—

‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, র’য়েছ নয়নে নয়নে···

গাইতে গাইতে এক সময় দারুণ একটা যন্ত্রণা তার পেট থেকে সারা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্থর কেটে

যায়। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। চোখ দুটো বুজে আসে।

'কি বউদি, কি হল ?'

'কিছু নয়।'—অনুসূয়া ম্লানভাবে হাসে। নিজের বেদনার কথা প্রকাশ করতে চায় না।

অভিষেক সুরু হয় লোকাচারের মধ্য দিয়ে। কপাল আর সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর এঁকে দেওয়া হয়, বাজে মঙ্গল শঙ্খ, হুলুধ্বনি।

অনুসূয়া কাঁপছে থর থর করে। তার আনন্দ-বেদনায় মেশানো অশ্রু উপচে পড়ে চোখ দিয়ে। দেওয়ালে টাঙানো বিকাশের ফোটোর দিকে দৃষ্টি চলে যায়। না না, চোখে কিছুতেই যেন জল না আসে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সে।

'তোমাকে আজ এত চমৎকার দেখাচ্ছে বউদি—ঈর্ষা হয়।'

'ইস্ ঠাট্টা করতে হবে না আর।'

'না ঠাট্টা নয়, সত্যি। চেহারায় হঠাৎ কেমন লাবণ্য লেগেছে—মাতৃত্বের দ্যুতি······'

'অনধিকার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।' লজ্জানম্র অনুসূয়ার মন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে।

মিট্টু হেসে বলে, 'সামনের বছর এমন দিনে বউদির খুশী দেখে কে। খোকন মা মা করে গুট গুট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যুদ্ধ ফেরৎ খোকনের বাবা—একেবারে যাকে বলে জমজমাট আবহাওয়া।'

অনুসূয়া বলে, ‘জান, তোমার দাদা কলকাতায় থাকতে ইচ্ছুক নন। তিনি নাকি মফঃস্বলে প্র্যাকটিস করবেন। আমার কিন্তু বড় সহরই ভাল লাগে। তবে তিনি যে ছবি চোখের সামনে তুলে ধরেন সেটাও ভারী লোভনীয়। ছোট সহরের ছোট্ট বাড়ী, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, ফুলের বাগান, দুপুরের অলস মুহূর্ত, সন্ধ্যার অবকাশ, রাত্রির নিবিড় একাত্মতা আবার সকালের কমব্যস্ততা। বেশ লাগে। আমি ভাই খুব অদ্ভুত ভাবে আন্তপ্রাদেশিক বিবাহের নায়িকা হয়ে গেলেও খুবই ঘরোয়া ধরণের মেয়ে।’

‘সে আমি জানি বউদি। তোমার কথা শুনতে বেশ লাগে। বলোত, তুমি কি হলে সবচেয়ে খুশী হবে বলে মনে কর।’

উৎসাহিত অনুসূয়া মনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।—‘মা হলে—মা……’ কথাটা বলেই লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

মিট্টু ঠাট্টা করে না। রাজনীতি করা জিজ্ঞাসু মন তার। মানুষের বাস্তব আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তার গভীর সহানুভূতি। বলে, ‘শুনে খুশী হলাম। তুমি লক্ষ্মী বউদি আমাদের।’

‘ছেলেমেয়েদের মানুষ করব নিজের মনের মত করে। তারা সকলেই হবে খ্যাতিমান। স্বামী সংসারের সমস্ত ভার আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাইরে কাজ করবেন আর আমি সংসার সামলাবো। কোন ঝগড়া

নেই, দ্বন্দ্ব নেই, সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি জানি তোমাব দাদাও তাই চান। তিনি আমায়……'

হঠাৎ অনুসূয়া থেমে যায়। উচ্ছ্বাসের মাথায় সে একেবারে একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চলে এসেছে।

'দাদা তোমায় কি বউদি ?'

'ঢোক গিলে অনুসূয়া বলে, 'আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। ওঁর সান্নিধ্য আমার সমস্ত সত্তাকে পবিত্র করেছে।'

অনুসূয়া মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে যেন বিকাশের একটু স্পর্শ অনুভব করে নেয়। বলে, 'যাবাব দিন আমার চোখের জল মুছে দিয়ে বলেছিলেন, যেদিন তিনি খবব পাবেন আমি মা হয়েছি, সেদিন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে মনে কববেন। সেদিন কি যে গৌরব অনুভব করেছি মনে মনে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। অন্তরের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত মমতা দিয়ে লালন করছি পেটের সন্তানকে। নিজেকে দিয়েও যেন দেওয়া অপূর্ণ আছে বলে মনে হয়। সন্তান দিয়ে তাই পূর্ণ কবব।'

মিট্টু বোঝে এ বিবহী স্ত্রীর প্রবাসী স্বামীকে নিয়ে উচ্ছ্বাস, ভাবপ্রবণতা।

'মিট্টু ভাই, জীবনে আমার অভিজ্ঞতাটা বড় তিক্ত।'

মিট্টু জানে না অনুসূয়ার ব্যক্তিগত ইতিহাস। বাড়ীর লোকেব অজ্ঞাতে সে দাদাকে বিয়ে করেছে—এইটুকুই শুধু তাব জানা আছে। অনুসূয়া যেভাবে কথা টানছে তাতে

শেষ পর্যন্ত আবহাওয়াটা ভারী হয়ে ওঠবার আশঙ্কা আছে। কাজেই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য সে বলল, ‘আচ্ছা বউদি, কি নাম রাখবে তোমার বাচ্চার ?’

‘যা তোমাদের ভাল লাগে ? তুমিই তার নাম রেখো।’

দরজার কড়া নড়ে উঠল। দুজনে উৎকর্ণ হয়ে মুহূর্তের জন্য নীরব রইল।

ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে উড়ে এসে পড়ল একটা খামে আঁটা চিঠি—অনুসূয়া মজুমদারের নামে।

‘দাদার চিঠি। দেখলে বউদি, পাগল হয়ে উঠেছিলে চিঠির জন্য, পেলে তো।’

‘তাই নাকি ? দাও দেখি।’

মিন্টু ওর হাতে দিল খামখানা।

ক্ষিপ্র হাতে অনুসূয়া খুলে ফেলল খাম। আনন্দে উত্তেজনায় সে যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। মিন্টু উঠে গেল বাইরে। বউদিকে সে একান্তে বসে উপভোগ করতে দিতে চায় চিঠিটা।

‘চিঠি দিতে দেরী হল বলে রাগ কোরো না। গত কয়েকদিন আমরা কখনও সামনে কখন পেছনে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি। এখানকার বিস্তারিত খবর লিখলে সেন্সরে আটকায় তাতো জানোই। কাজেই আর কিছু জানতে চেয়ো না। এ কয়দিন চিঠি লেখার অবকাশই করতে পারিনি। আজ অতি কষ্টে তোমার জন্য পঁচিশটা মিনিট

সংগ্রহ করলাম কারণ কাল রাতে এক খড়ের গাদায় শুয়ে যে মধুর স্বপ্ন দেখেছি, তাতে হঠাৎ তোমার জন্য ভীষণ মন কেমন করছে। তুমি ভালো আছো তো? আমার সমস্ত ভালবাসা আব শুভ কামনা দিলাম তোমায়।'

অনুসূয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় সুরু হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে আত্মস্থ হয়ে সে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে নিল আকাশ পথে পাঠানো স্বামীব ভালবাসার উত্তাপ।

'তোমাকে আর খোকনকে নিয়ে আমি যেন পুনার লোনাভেলা উপত্যকায় বেড়াতে গেছি। কি আশ্চর্য, খোকনকে তুমি দেহের মধ্যে অনুভব করছ আর আমি তাকে দেখলাম—এক মাথা চুল, হাটতে শিখেছে, কথা ফোটেনি ভাল করে, হাতে একটা কাপড়ের পুতুল। চোখে তুমি তার কাজল দিয়ে দিয়েছো। তুমিও কবেছ খুব সাজগোজ প্রসাধন—খোপায় ফুল, কপালে কুমকুম, চোখে কাজল বেখা। বেশী সাজগোজ করে তোমাব চোখেমুখে একটা লজ্জাব ভাব ফুটে উঠেছে, তাতে তোমাকে আরও সুন্দব দেখাচ্ছে। পাহাড়ের নীচে অনেক বেড়াবার পর ঝরণাব ধারে এসে বসলাম। তোমার কোলে মাথা বেখে আমি শুয়ে শুয়ে দেখছি খোকন প্রজাপতির পেছু নিয়ে ছুটোছুটি করছে অদূরে। হঠাৎ সে ব্যর্থ হয়ে ছুটে ফিরে এল তোমার দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তাকে

লুফে নিলে। দুষ্টু ছেলেটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তোমার কোলে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে তোমার এত সাধের সাজগোজ প্রসাধন একেবারে তছনছ করে দিল তার ছোট ছোট দুটি হাত দিয়ে। আঁচল খসল, খোপার ফুল মাটিতে গড়াগড়ি গেল, কুমকুম লেপটে গেল সারা কপালে, কাজলের দাগ এসে লাগল গালে। কিন্তু সেদিকে তোমার খেয়াল নেই। ছেলেকে বুকে চেপে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তুমি তার মাথায় চুমু খাচ্ছো। খোকন আবার ছুটে পালালো তোমার কোল থেকে। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম তোমাকে। বিলীয়-মান সূর্যের আভা লেগেছে তোমার মুখের পরে। ভাবমুগ্ধ চাহনি তোমার গতিশীল খোকনের উপর নিবদ্ধ। আমার অস্তিত্ব যেন ভুলেই গেছো। হঠাৎ নজরে পড়তেই লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি অবিন্যস্ত বেশবাস ঠিক করতে লাগলে। ফুলটা তোমার খোপায় পরিয়ে দিতে দিতে ঠাট্টা করে বললাম, খোকন তোমার এত সাধের সাজ প্রসাধন দিল তো নষ্ট করে এক মিনিটেই। আমার বুকে মাথা রেখে তুমি বললে— দিলই বা। তোমার মন ভোলাবার চেয়ে ওর মন রাখতে এখন আমার অনেক বেশী তৃপ্তি।

'কিন্তু খোকন তোমার উপর দস্যুপনা করে যে চেহারা তোমার করেছিল, তাতে তুমি আমার কাছে এত বেশী লোভনীয় হয়ে উঠেছিলে যে আমি তোমার ঠোঁটে চুমু না দিয়ে পারি নি।

'আমার বিভ্রান্তি লাগছে—সত্যিই স্বপ্ন দেখছিলাম না আমার কল্পনা।

'কে জানে পৃথিবীটা কালকেই ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা। যারা থাকবে তারা যেন সুখীই হয়। আমাদের খোকনকে দিও আমার অফুরন্ত ভালবাসা আর শুভ কামনা।

—তোমার বিকাশ।'

প্রচণ্ড আওয়াজ করে খুলে গেল ভেজানো দরজা। চোখ তুলে তাকালো অনুসূয়া। পশ্চিম সূর্যের ম্লান আলোয় চকমকিয়ে উঠল তার মুখটা। হাওয়ায় উড়ল রঙ্গীন পর্দাগুলো। দরজার দুই কবাটে হাত দিয়ে স্তব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে মিট্রু। অনুসূয়া একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারল না।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে দিল্লীর জেনারেল হেডকোয়ার্টার থেকে সদ্য পাওয়া টেলিগ্রামটা খুলে ফেলল মিট্রু।

মিসেস অনুসূয়া মজুমদার সমীপেষু—

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার বীর স্বামী ক্যাপ্টেন বিকাশ মজুমদার রণাঙ্গনে লড়াই করতে করতে সসম্মানে নিহত হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে এবং গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

—অচিনলেক (জেনারেল)

ঘরের মধ্যে অনুসূয়া ভাবছে লোনাভেলা উপত্যকার প্রমোদ ভ্রমণের কথা। মিট্টুর ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ তার কানে যায় নি। তার কানে বাজছিল ঝরণার জল-তরঙ্গ,—রঙ্গীন প্রজাপতি পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে নীল আকাশের নীচে আর বিকাশ শুয়ে আছে তার কোলে মাথা রেখে। ছোট শিশু এলোমেলো পায়ে ছুটছে প্রজাপতির পেছনে--ক্লান্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার বুকে, ছোট ছোট হাতে তার গলা জড়িয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করছে আধো আধো ভাষায়।

একটা তীব্র যন্ত্রণা আবার অনুসূয়ার জঠর থেকে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। একটা দুঃসহ আদিম বেদনা তাকে চেতন থেকে অবচেতনের পথে টেনে নিল।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

(উপন্যাস)

একদা

গোপাল হালদার

দাম—সাড়ে তিন টাকা

পঞ্চাশের পথ, উনপঞ্চাশী, তেরশ' পঞ্চাশ

গোপাল হালদার

দাম যথাক্রমে—চার, সাড়ে তিন ও সাড়ে চার টাকা

নিশীথ সূর্য্যের দেশ

অমল সান্যাল

দাম—আড়াই টাকা

(দর্শন এবং সমাজ ও সাহিত্য)

সংস্কৃতির রূপান্তর

গোপাল হালদার

দাম—পাঁচ টাকা

মার্ক্সীয় দর্শন

সরোজ আচার্য্য

দাম—পাঁচ টাকা

(জীবন আলেখ্য)

লেনিনের স্মৃতি

ক্লারা জেটকিন

দাম—দেড় টাকা

লেনিনের কথা

ম্যাক্সিম গোর্কি

দাম—দেড় টাকা

(ছোট গল্প)

ভানুমতীর খেল

প্রদ্যোৎ গুহ

দাম—দুই টাকা

রুশ গল্প

অমল সান্যাল

দাম—দুই টাকা